জীবন আসে জীবন থেকে

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

আর আমি তাদের বলি (বৈজ্ঞানিকদের), "রাসায়নিক পদার্থ থেকেই যদি জীবনের উদ্ভব হয়ে থাকে, এবং তোমার যদি এত উন্নত বৈজ্ঞানিক হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের রসায়নাগারে জৈব-রসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমরা কেন জীবন সৃষ্টি করতে পারছ না?"

–শ্রীল প্রভুপাদ

লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে মহাসাগরের তটে প্রাতঃভ্রমণরত
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

জীবন আসে জীবন থেকে

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

এবং

তাঁর কয়েকজন শিষ্য ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রাতঃভ্রমণকালে
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনার বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক ঃ ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Life Comes from Life (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	ঃ	১৯৮৩	১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৮৭	৫,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৯০	১০,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৪	১০,০০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	১৯৯৬	২০,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৮	১০,০০০ কপি
সপ্তম সংস্করণ	ঃ	১৯৯৯	১০,০০০ কপি
অষ্টম সংস্করণ	ঃ	২০০২	১০,০০০ কপি
নবম সংস্করণ	ঃ	২০০৩	১০,০০০ কপি
দশম সংস্করণ	ঃ	২০০৪	৫,০০০ কপি
একাদশ সংস্করণ	ঃ	২০০৫	৫,০০০ কপি
দ্বাদশ সংস্করণ	ঃ	২০০৬	৫,০০০ কপি
ত্রয়োদশ সংস্করণ	ঃ	২০০৭	৫,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

যে সমস্ত মানুষ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রতিটি কথাকেই ধ্রুব সত্য বলে মনে করেন, এই গ্রন্থটি তাঁদের চোখে জ্ঞানের অঞ্জন পরিয়ে তাঁদের চোখ উন্মীলিত করবে। 'জীবন আসে জীবন থেকে' নামক এই গ্রন্থটি হচ্ছে 'Life Comes From Life' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং পণ্ডিত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অতি উজ্জ্বল সমালোচনা। শ্রীল প্রভুপাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবনের উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত মতবাদগুলি যে কত ভ্রান্ত তা প্রকট হয়ে উঠেছে।

১৯৭৩ সালে লস্ এঞ্জেলেসে তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ প্রাতঃভ্রমণের সময়ে যে কথোপকথন হয়, তার ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। সেই সকালগুলিতে প্রভুপাদ যখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা করতেন, তখন তিনি বিশেষ করে তাঁর একজন বৈজ্ঞানিক শিষ্য ডঃ থৌডম দামোদর সিং (পি.এইচ.ডি)-এর সঙ্গেই তা করতেন। ডঃ সিং হচ্ছেন একজন রসায়নবিদ্ বৈজ্ঞানিক। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের 'ভক্তিবেদান্ত ইন্‌স্টিটিউট' নামক বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় অতি উন্নত স্তরের গবেষণার একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং ইস্কনের বর্তমান আচার্যবর্গের অন্যতম।

পৃথিবীর যেখানেই হোক্ না কেন, শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিদিন খুব ভোরবেলায় দীর্ঘ প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর গায়ে জড়ানো থাকত একটা গরম চাদর এবং তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং বিশেষ কোন অতিথি। কোন কোন দিন সকালবেলায় তিনি নিঃশব্দে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন এবং সচরাচর দু'একটি কথা বলতেন। আবার কোন কোন দিন তিনি বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে অনেকক্ষণ ধরে

আলোচনা করতেন। এই সমস্ত প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে দার্শনিক বিচার শুষ্ক নীরস কতকগুলি জল্পনা-কল্পনা নয়, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুতীক্ষ্ণ বিচারের মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোন বিরুদ্ধ মতবাদ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং অসাধারণ বিচক্ষণতা থেকে নিস্তার পেত না। তাঁর শিষ্যদের অগভীর চিন্তাধারা এবং অন্ধ-বিশ্বাস খণ্ডন করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তিরস্কার করে এবং সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে তিনি তাদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রদান করতেন, এবং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তিনি তাদের যথার্থ জ্ঞান এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভের পথে পরিচালিত করতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) হচ্ছেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, পণ্ডিত এবং পারমার্থিক পথপ্রদর্শক। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। 'জীবন আসে জীবন থেকে' গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ একজন দার্শনিক ও সামাজিক সমালোচকরূপে আধুনিক যুগের সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদগুলির সমালোচনা করেছেন। কঠোর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রাণখোলা সারল্য নিয়ে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি কেবল তার ভ্রান্তিই প্রদর্শন করেন নি, আধুনিক বিজ্ঞান যে কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই তাদের মনগড়া অনুমানগুলিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে প্রচার করে জনসাধারণকে প্রতারিত করছে, তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। স্থূল জড়বাদসম্পন্ন যে সমস্ত নাস্তিক মতবাদ আজ বিজ্ঞানের মুখোশ পরে আধুনিক সভ্যতাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, শ্রীল প্রভুপাদ তার সেই মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

—প্রকাশক

ভূমিকা

বিজ্ঞান ঃ বাস্তব সত্য না অলীক কল্পনা

একটা সময় ছিল যখন আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতাম যে, আমরা যা খাচ্ছি তা বিজ্ঞাপনের দাবী অনুসারে সর্বতোভাবে পুষ্টিকর এবং তাতে কোনরকম ভেজাল বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নেই। একটা সময় ছিল যখন প্রায় সকলেই মনে করত যে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা, রাজনৈতিক নেতারা এবং সামাজিক নেতারা সকলেই অত্যন্ত সৎ-চরিত্র সম্পন্ন। একটা সময় ছিল যখন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব ভাল শিক্ষা লাভ করছে। একটা সময় ছিল যখন আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতাম যে, আণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং তার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ ও তার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা আরও সুস্থ, সবল এবং সুখী হয়ে উঠবে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেই মোহ কেটে গেছে। খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতারণা আমাদের সরল বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন আমরা জানি যে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং কেতাদুরস্ত বিক্রয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক কুহেলিকার সৃষ্টি করা সম্ভব, যার ফলে ক্রেতারা সম্পূর্ণভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বুঝতে পারে না তারা কি কিনছে।

আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করছে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে তারা এখনও পর্যন্ত কোনরকম প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল প্রভুপাদ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই ভয়ঙ্কর অন্ধ বিশ্বাসটি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের অসম্ভব ক্ষতি করেছে এবং তার ফলে অপরিসীম অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ যদিও আভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং পরস্পরের আবিষ্কারের প্রতি গভীরভাবে সন্দিহান, তবুও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে তারা

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুক্তভাবে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা যা করছে, তা জঘন্যতম রাজনৈতিক সংঘবদ্ধ প্রতারণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট'গুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা এবং সরকার একের পর এক 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট' বানিয়ে চলেছেন, যদিও তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে সেগুলির 'রেডিও-অ্যাকটিভ' আবর্জনাগুলি নিয়ে তারা কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। অর্থাৎ, এই 'রেডিও-অ্যাকটিভ' আবর্জনাগুলি আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে আগামী দিনের মানুষদের জন্য যে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করবে, তা তারা স্বীকার করছেন।

তাদের কার্যক্ষেত্রে এবং পাঠ্যপুস্তকে বৈজ্ঞানিকেরা জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বলেছেন যে, জড় পদার্থ থেকে ঘটনাক্রমে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এবং সেটিই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। তারা দাবী করছেন যে, অন্য কোন মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সাধারণ মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, "Primordial Soup" থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন এবং অন্য কতকগুলি অপরিহার্য উপাদানের সমন্বয়ের ফলে ধীরে ধীরে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল। অথচ তাদের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে এবং তাদের ব্যক্তিগত আলোচনায় সেই বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাদের এই মতবাদে অনেক গলদ রয়ে গেছে, যার ফলে এই বিষয় নিয়ে তাদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ডি.এন.এ-র 'কোডিং মেকানিজ্‌ম'-এ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, যার ফলে জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল এই মতবাদ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বিখ্যাত বায়োলজিস্ট ডব্লিউ. এইচ. থর্প লিখেছেন, "ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিষয়ের মত আমাদেরও হয়ত জীবনের উৎসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হবে, যার ফলে বায়োলজি ধীরে ধীরে কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সে পর্যবসিত হবে।" বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জ্যাকুয়াস মনোও এই একই ধরনের অসুবিধার কথাই বলেছেন। থিয়োডিসাস ডোবজানস্কি নামক আর একজন বিবর্তনবাদী স্বীকার করেছেন, "জড় থেকে জীবন, অচেতন থেকে

চেতনের বিবর্তন সম্বন্ধে আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সন্তুষ্টিজনক তথ্য প্রদান করতে পারছে না। ডব্লিউ. এইচ. থর্প ও জ্যাকুয়াস মনোর মত জীব বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও এই বিষয়ে তারা একমত যে, জীবনের উৎস হচ্ছে একটি অতি জটিল এবং অনির্ধারিত ও অমীমাংসিত সমস্যা, তাদের সঙ্গে আমিও একমত।" ডোবজানস্কি জীবনের উৎসকে অলৌকিক (miraculous) বলে অভিহিত করেছেন। এমন নয় যে ডোবজানস্কি, মনো এবং থর্পই এইভাবে তাদের মতবাদের ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন, আজকের প্রায় সবকটি প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানীই জীবনের উৎস সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতার কথা কোন না কোন ভাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবুও তাদের এই ভ্রান্তির কথা জনসাধারণের কাছে এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশ করা হচ্ছে না।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পদার্থ বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার প্রমাণ করেছেন যে, self-duplicating unit-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্য। যেহেতু জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি, তাই উইগনার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাদের পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের বর্তমান ধারণা জীবন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারে না। হারবার্ট ইয়কি information theory-র মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন যে, সাইটোকোম সি-এর মত অতি মৌলিক অণুও পৃথিবীর অস্তিত্বের সময়ের মধ্যে ঘটনাক্রমে উদ্ভূত হতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য জটিল জীবের সম্বন্ধে ত' কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। ঘটনাক্রমে এবং প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে যে এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল, সেটা প্রমাণ অথবা বিশ্বাসের ভিত্তিতে এখনও প্রতিপন্ন হয় নি।

আমরা দেখতে পাই যে একদিকে অনেক বৈজ্ঞানিক গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। আবার সেই সঙ্গেই দেখা যায় যে, তারা তাদের সেই বিশ্বাস প্রতিপন্ন করার জন্য কোনরকম প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারেন না, এবং তাদের সেই মতবাদগুলি নানারকম সমস্যায় পূর্ণ। জড় পদার্থ থেকে যে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাদের কোন সন্দেহ নেই, অথচ একই সময়ে তাদের সেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার মত যে

যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, সে কথাও তারা নিজেরাই স্বীকার করছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, তাদের এই মতবাদ অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়, তার সঙ্গে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কোন যোগাযোগ নেই। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, একদিন কারোর দ্বারা তাদের এই ধারণাগুলি প্রমাণিত হবে, এবং আপাতত এই সমস্ত অন্ধ মতবাদগুলি সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস অটুট রয়েছে।

আধুনিক যুগে চোখ-ধাঁধানো যান্ত্রিক প্রগতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা আত্মগর্বের ভাব এনে দিয়েছে, এবং তার ফলে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা যখন বৈজ্ঞানিক উৎস সম্বন্ধে তাদের অপরীক্ষিত আনুমানিক মতবাদগুলি উপস্থাপিত করে, সাধারণ মানুষ তখন অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাদের সেই মতবাদগুলি স্বীকার করে নেয়। 'Passages about Earth'-নামক গ্রন্থে উইলিয়াম আরউইন টমসন লিখেছেন, "এক সময় যেমন নরকে পতিত হওয়ার ভয়ে কেউ গীর্জার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না, তেমনই আজকের মানুষ বিকৃত মনোভাবাপন্ন বা পাগল বলে প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে না।" জীববিজ্ঞানী গ্যারেট হার্ডিন বলেছেন, "ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে কেউ যদি কোন সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে মনস্তত্ত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

'জীবন আসে জীবন থেকে' নামক গ্রন্থের কথোপকথনগুলি বৈপ্লবিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নিউটন, আইনস্টাইন, পাস্তর কি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী ছিলেন না? 'জীবন আসে জীবন থেকে' আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ—"জড় থেকে জীবনের উৎপত্তি"-এরই কেবল সমালোচনা করে নি, উপরন্তু এই গ্রন্থটি সত্য ও জ্ঞান আহরণের পথে বৈজ্ঞানিকদের আরও গভীরভাবে এবং আরও নিশ্চিতভাবে প্রয়াসী হতে এবং এইভাবে তাদের উন্নত বুদ্ধিমত্তা, সংস্থান এবং কার্যক্ষমতাকে জগতের যথার্থ কল্যাণ সাধনের দিকে পরিচালিত করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

—থৌডম দামোদর সিং, পি. এইচ. ডি

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়।

এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর রচিত বৈদিক দর্শনের এই সমস্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫ টি গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি

অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এইরকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
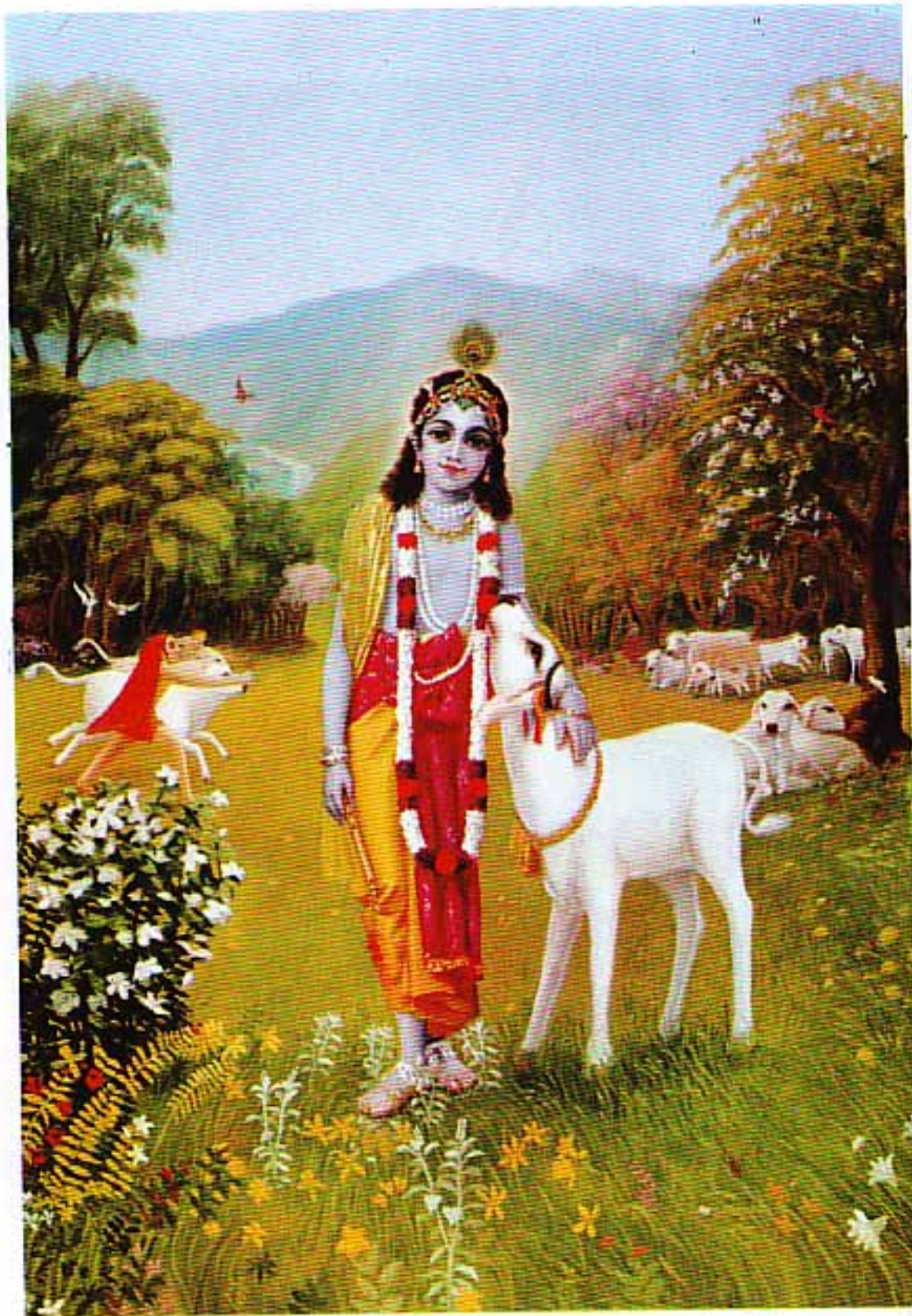
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

প্রতিনিয়ত দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।
অবশেষে দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা আরেকটি নতুন দেহ ধারণ করে।

দেহরূপী রথের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অশ্ব, মন, বল্গা, বুদ্ধি, সারথী এবং আত্মা সেই রথের রথী।

মানুষ, তার কর্ম অনুসারে পরবর্তী দেহ ধারণ করে।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক-একটিতে প্রবেশ করে নিজ অঙ্গ-নিঃসৃত জলে শায়িত হন। তাঁর নাভি থেকে প্রকাশিত পদ্ম থেকে ব্রহ্মাণ্ডের জীব ব্রহ্মার জন্ম হয়।

এই জড় জগৎ হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের বিকৃত প্রতিবিম্ব।

লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের তটে প্রাতঃভ্রমণরত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

প্রথম প্রাতঃভ্রমণ

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩
এই কথোপকথনটি বাণীবদ্ধ করা হয়
লস্ এঞ্জেলেসের শ্যেভিয়ট হিল্‌স্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ থৌডম দামোদর সিং, করন্ধর দাস অধিকারী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

অন্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সূর্য এবং চন্দ্রেও জীব রয়েছে। সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি?

ডঃ সিং ঃ তারা বলে যে সেখানে কোন জীবন নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাদের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অর্থহীন। ওখানে জীবন আছে।

ডঃ সিং ঃ ওরা বলে যে চাঁদে কোন জীব নেই, কেননা তারা যখন চাঁদে গিয়েছিল, তখন তারা সেখানে কোন জীব দেখতে পায়নি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা কিভাবে সেটা বিশ্বাস করে? চন্দ্র গ্রহ ধূলির আবরণে আচ্ছাদিত, সেই ধূলির মধ্যে জীব থাকতে পারে। প্রতিটি আবহাওয়াই জীবনের উপযুক্ত—যে কোনও পরিস্থিতিতে জীবন থাকতে পারে। তাই বেদ গ্রন্থে জীবকে 'সর্বগতঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে "সবরকম অবস্থায় জীব থাকতে পারে।" জড়দেহে আবদ্ধ হয়ে থাকলেও জীব জড় নয়। বিভিন্ন আবহাওয়া বা পরিস্থিতি মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জড় অবস্থা।

করন্ধর ঃ তারা বলে যে চাঁদের আবহাওয়া জীবনের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কিন্তু আসলে তারা বলতে চায় যে জীবন সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা, সেই ধারণা অনুসারে চন্দ্র গ্রহটি বসবাসের অনুপযুক্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বেদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে জড় পদার্থের সঙ্গে জীবের কোন যোগাযোগ নেই। জীব অর্থাৎ আত্মাকে আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না, অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, বায়ু দিয়ে শুকানো যায় না এবং জলের দ্বারা ভেজানো যায় না; সে সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* আলোচনা করা হয়েছে।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে এই গ্রহে জীবন সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা, সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা স্থির করতে পারবে অন্য গ্রহে জীবন আছে কি নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তারা সবার আগে নিজেদের কথা ভাবছে। তাদের এই চিন্তাধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ, তা কেবল তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটাকে আমরা বলি, "কূপমণ্ডুক দর্শন।"

একটা কুয়োতে একটা ব্যাঙ ছিল এবং তার এক বন্ধু এসে যখন তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলল, তখন সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "ওঃ, এই প্রশান্ত মহাসাগরটি কি?" তার বন্ধু উত্তর দিল, "এটা একটি মহাসাগর—একটি প্রকাণ্ড বড় জলাশয়।"

"কত বড়? এই রকম দুটো কুয়োর মতো?"

তার বন্ধু উত্তর দিল, "না, না—তার থেকে অনেক বড়।"

"কত বড়? এ রকম দশটা কুয়োর মতো? বিশটা কুয়োর মতো?" এইভাবে ব্যাঙ মশাই সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে কি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালত্ব উপলব্ধি করা যাবে? আমাদের ক্ষমতা, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অনুমানশক্তি অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত অনুমানগুলি এই ব্যাঙ মশাইয়ের দর্শনের মতো।

করন্ধর ঃ তারা যাকে "বৈজ্ঞানিক নীতি" বলছে, তার ভিত্তি হচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। সরাসরিভাবে যে অভিজ্ঞতাগুলি তারা অর্জন করেছে সে সম্বন্ধেই কেবল তারা তাদের মতামত পোষণ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পার, আর আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। কিন্তু আমি কেন তোমার অভিজ্ঞতা চরম বলে মেনে নেব? তুমি একটা নির্বোধ, মূর্খ হতে পার, তা বলে আমি কেন একটা মূর্খ হতে যাব? তুমি একটা ব্যাঙ হতে পার, কিন্তু আমি যদি একটা তিমি হই? তোমার কুয়োকেই আমি সর্বস্ব বলে মেনে নেব কেন? বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করবার নিজস্ব প্রক্রিয়া তোমার থাকতে পারে, এবং তা আমারও আছে।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র-পৃষ্ঠে জল খুঁজে পায় নি, তাই তারা সিদ্ধান্ত করেছে যে, সেখানে কোন জীব থাকতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা কি সমস্ত চাঁদে ঘুরে দেখেছিল? অন্য গ্রহ থেকে কেউ যদি এখানে এসে আরবের মরুভূমিতে নামে এবং সেখান থেকে ফিরে যায়, তাহলে কি সে সমস্ত পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জানতে পারবে? পৃথিবী সম্বন্ধে সে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যেতে পারবে না।

করন্ধর ঃ জল আছে কিনা সেটা দেখবার জন্য একটা যন্ত্র তাদের আছে। তারা বলছে যে তারা সেই যন্ত্রটি নিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছে, এবং তার ফলে তারা জানতে পেরেছে যে চাঁদের কোথাও জল নেই এবং তাই সেখানে জীবন থাকতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সূর্যেও আপাতদৃষ্টিতে জল নেই, কিন্তু তবুও সেখানে জীবন রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে জল ছাড়া মরুভূমিতে কাঁটা গাছগুলি জন্মাচ্ছে কি করে?

করন্ধর ঃ তারা বায়ু থেকে জল আহরণ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, বায়ুমণ্ডলে জীবন ধারণের জন্য সবকটি উপাদানই রয়েছে। যেমন, আমার দেহে জল রয়েছে, যদিও তুমি সেটা দেখতে পাচ্ছ না; তেমন আমার দেহে যে আগুন রয়েছে, তাও তুমি দেখতে পাচ্ছ না; কিন্তু সেই আগুনের প্রভাবে আমার শরীর উত্তপ্ত হচ্ছে। এই

উত্তাপ আসছে কোথা থেকে? তুমি ত' কোন আগুন দেখতে পাচ্ছ না। আমার শরীরে যে আগুন জ্বলছে, সেটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এই তাপ আসছে কোথা থেকে? তার উত্তর কি?

পরমাণু হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সমস্ত জড় বস্তুই হচ্ছে পাঁচটি স্থূল পদার্থ (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি সূক্ষ্ম পদার্থ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার)-এর সমন্বয়।

করন্ধর ঃ বৈদিক জ্ঞান অনুসারে জড়-শক্তির প্রথম প্রকাশ হচ্ছে অহংকার। তারপরে তা বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তারপরে মনে এবং তারপরে আকাশ, বায়ু, আগুন, জল এবং মাটি এই স্থূল উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত হয়। এই সবকটি মৌলিক উপাদান দিয়েই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, তাই নয় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। এই জড় জগতের প্রকাশ একটি ক্ষুদ্র বীজের বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হওয়ার মত। বীজের মধ্যে গাছটি দেখা যায় না, কিন্তু গাছের সবকটি প্রয়োজনীয় উপাদান তার মধ্যে রয়েছে, এমনকি বুদ্ধিও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শরীরই হচ্ছে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের নমুনা। তোমার শরীর এবং আমার শরীর হচ্ছে দুটি ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। তাই আটটি জড় পদার্থই আমাদের শরীরে বর্তমান, ঠিক যেমন তারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান। তেমনই একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের শরীরও আর একটি ব্রহ্মাণ্ড।

করন্ধর ঃ পরমাণুগুলি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারাও তাই। এই সবকটি উপাদানই পরমাণুতে রয়েছে। *অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান* (কঠোপনিষদ ১/২/২০)। অর্থাৎ, যত ক্ষুদ্রই হোক্ আর যত বৃহৎই হোক্, তা সবই একরকমের মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরী। জড়জগতের সর্বত্রই এই নিয়ম বর্তমান। ঠিক যেমন মেয়েদের হাতের ছোট্ট ঘড়িতে ঘড়ির সবকটি যন্ত্রই রয়েছে, ঠিক তেমনই একটি পিঁপড়ের মস্তিষ্কেও মস্তিষ্কের সবকটি প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে, যার ফলে সে তার কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে। এটা কি করে সম্ভব? তা যথাযথভাবে উত্তর দিতে হলে তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পিঁপড়ের মস্তিষ্কের টিস্যুগুলি পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু তুমি সেটা করতে পার না। আর কত অসংখ্য জীব রয়েছে, যারা একটা পিঁপড়ের থেকেও অনেক অনেক ছোট। এই সমস্ত কার্যকলাপের অবশ্য অতি উন্নত যান্ত্রিক আয়োজন রয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তা আবিষ্কার করতে পারে নি।

আপেক্ষিকত্ব এবং জ্ঞান

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ চারটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মত বুদ্ধি প্রতিটি জীবের রয়েছে। সেই চারটি প্রবৃত্তি হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। এই প্রবৃত্তিগুলি পরমাণুরও রয়েছে। কিন্তু মনুষ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবানকে জানার অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা তার রয়েছে। এটাই হচ্ছে একটা পশু এবং একটা মানুষের মধ্যে পার্থক্য। *আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।* আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের প্রবৃত্তিগুলি প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে। একটা গাছ কি ভাবে বর্ধিত হয় তা তোমরা দেখেছ। যেদিকে গেলে বাঁধা পড়বে সেদিকে ডালপালাগুলি বর্ধিত হয় না। গাছেরও চেতনা আছে, সেই চেতনা দিয়ে তারাও বিচার করে, "আমি যদি এদিকে যাই, তাহলে আমি বাধা পাব, সুতরাং আমি ওদিকে যাব।" কিন্তু তার চোখ কোথায়? সে তাহলে দেখে কি করে? তার বুদ্ধি আছে। তার বুদ্ধি তোমার মত এত উন্নত নাও হতে পারে, কিন্তু এটাও বুদ্ধি। যেমন, একটি শিশুরও

বুদ্ধি আছে, যদিও তা তার পিতার মত উন্নত নয়। তবে কালক্রমে সেই শিশুর শরীরটি যখন তার পিতার শরীরের মত হবে, তখন সেই শিশুর বুদ্ধিমত্তা আরও উন্নত হয়ে, বিকশিত হয়ে প্রকাশ পাবে।

ডঃ সিং ঃ তাহলে এই বুদ্ধিমত্তা আপেক্ষিক।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সবকিছুই আপেক্ষিক। তোমার একটা বিশেষ শরীর আছে, তার আয়ু আছে, এবং তার বুদ্ধিমত্তা আছে, আর একটা পিঁপড়েরও এগুলি আছে। আমাদের এবং পিঁপড়েদের সকলেরই আয়ু একশ' বছর। তবে আমাদের একশ' বছর, এই শরীরের চেতনা অনুসারে একশ' বছর। এমনকি ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন জীব, তাঁরও আয়ু একশ' বছর। আমাদের মনে হতে পারে যে একটা পিঁপড়ের আয়ু মোটে কয়েকটি দিন মাত্র। ঠিক তেমনই আমাদের এই পৃথিবী থেকেও ভিন্ন আবহাওয়া সম্পন্ন অন্যান্য গ্রহে সেখানকার আবহাওয়া অনুসারে জীবন রয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সবকিছুই কেবল এই পৃথিবীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চায়। সেটা তাদের মূর্খতা। যদি সমস্ত জড়া-প্রকৃতি আপেক্ষিক নীতি অনুসরণ করে, তাহলে বৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে বলে যে, এই গ্রহের অবস্থা অন্যান্য গ্রহের জীবদের উপরও প্রযোজ্য হবে?

বেদ নির্দেশ দিচ্ছে যে দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে জ্ঞান বিবেচনা করতে হয়। দেশ মানে হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কাল মানে সময়, এবং পাত্র মানে হচ্ছে বিষয়। এই তিনটে বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে আমাদের সবকিছু বুঝতে হবে। যেমন, একটা মাছ খুব আরামে জলে বাস করে, [illegible] এই সমুদ্রের তীরে আমরা ঠাণ্ডায় কাঁপছি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশ, কাল, পাত্র এবং মাছের দেশ, কাল, পাত্র ভিন্ন। তেমনই আমরা যদি সিদ্ধান্ত করি যে, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমরা যেহেতু শীতে কাঁপছি তাই সমুদ্রের পাড়ে এই গাঙচিলগুলোও শীতে

কাঁপবে, সেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন সিদ্ধান্ত। গাঙচিলদের দেশ, কাল, পাত্র আমাদের দেশ, কাল, পাত্র থেকে ভিন্ন। এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের জীব শরীর রয়েছে, এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিটি জীব বিভিন্ন অবস্থায় বাস করছে। এমনকি এই গ্রহেও। তুমি আলাস্কায় গিয়ে আরামে থাকতে পারবে না, যদিও তা আমেরিকারই একটা অংশ। তেমনই যারা আলাস্কায় বসবাস করছে তারা যদি এখানে আসে তাহলে তাদের খুব কষ্ট হবে।

করন্ধর ঃ তার মানে আপেক্ষিকত্ব নির্ভর করছে আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থার উপর।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তাই বলা হয় যে, একজনের আহার অন্য আরেকজনের বিষ।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ বৈজ্ঞানিকেরা যেহেতু চাঁদে বসবাস করতে পারল না, তাই তারা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করল কেউই সেখানে বসবাস করতে পারে না।

৮৬৪ কোটি বছরে একদিন

ডঃ সিং ঃ এই জগতের সমস্যা হচ্ছে যে প্রায় সকলেই তাদের নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বিচার করার চেষ্টা করছে—এবং সেটা অর্থহীন।

জনৈক শিষ্য ঃ যে কোনদিনও তার গ্রাম থেকে বাইরে যায় নি, সে মনে করে যে তার গ্রামটাই হচ্ছে সমস্ত জগৎ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। কুয়োর ব্যাঙ সবসময় তার কুয়োর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে। এছাড়া কোনভাবে চিন্তা করার উপায় তার নেই। সমুদ্র বিশাল, কিন্তু সে সমুদ্রের বিশালত্ব মাপবার চেষ্টা করছে তার নিজের আয়তনের মাধ্যমে। তেমনই ভগবান মহান, কিন্তু আমরা আমাদের

আপেক্ষিক মহত্ত্বের মাধ্যমে ভগবানকে জানবার চেষ্টা করছি। কিছু পোকা আছে, যারা রাত্রিবেলায় জন্মে, বর্ধিত হয়ে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে সকাল হওয়ার আগেই মরে যায়। তারা সূর্যের আলো দেখার সুযোগ পায় না। এখন তারা যদি সিদ্ধান্ত করে যে সকাল বলে কিছু নেই, তাহলে সেটা একটা মস্ত বড় বোকামি ছাড়া কিছু নয়। তেমনই যখন আমরা শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে, ব্রহ্মার একদিন আমাদের কোটি কোটি বছরের সমান, তখন আমরা সেটা বিশ্বাস করি না। আমরা বলি, "সেটা কি করে হবে?" কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) বলা হয়েছে, *সহস্রযুগপর্যন্তম্ অহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*—'চারশ' বত্রিশ কোটি বছরে ব্রহ্মার বার ঘণ্টা হয়।' একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদও, যিনি *ভগবদ্গীতার* পণ্ডিত রূপে বেশ নাম কিনেছেন, তিনিও এই তথ্যটি স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে, এটি একটি মনগড়া অনুমান। লোকটা কত বড় নির্বোধ! আর সেই লোকটাকে মহাপণ্ডিত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সমস্যা। নির্বোধ-মূর্খগুলোকে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং তার ফলে সমস্ত পৃথিবী বিপথগামী হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রাতঃভ্রমণ

১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের শেভিয়ট হিল্‌স্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং, করন্ধর দাস অধিকারী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

ডারউইনের মতবাদ বিপর্যস্ত

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই জড় জগৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো—এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এই গুণ তিনটি সর্বত্রই কাজ করছে। এই গুণ তিনটি বিভিন্ন মাত্রায় সবরকমের জীবের মধ্যে বর্তমান। যেমন, কতকগুলি গাছ অতি সুস্বাদু ফল উৎপাদন করে, আর অন্য কিছু গাছ থেকে কেবল আগুন জ্বালাবার কাঠ পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রভাব। পশুদের মধ্যেও এই তিনটি গুণ বর্তমান। গাভী সত্ত্বগুণ, সিংহ রজোগুণ এবং বানর তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ডারউইনের মতে, তার বাবা হচ্ছে একটা বানর। (হাস্য) তিনি মূর্খের মত এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

ডঃ সিং ঃ ডারউইন বলেছেন যে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে কতগুলি প্রজাতি সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সংগ্রামে যারা জয়ী হয় তারাই বেঁচে থাকে। যারা জয়ী হতে পারে না তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাই তিনি বলেছেন যে, বেঁচে থাকা এবং অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া একই সঙ্গে চলছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিছুই অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। বানর অবলুপ্ত হয়ে যায় নি; ডারউইনের পূর্বপুরুষ বানরগুলি এখনও রয়েছে।

করন্ধর ঃ ডারউইন বলছেন যে প্রকৃতিগতভাবে অবশ্যই মনোনয়ন হচ্ছে, কিন্তু মনোনয়ন মানেই হচ্ছে ভাল-মন্দ বিচার করে পছন্দ করা, তাহলে এই পছন্দটা কে করছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যিনি করছেন তিনি অবশ্যই একজন সবিশেষ পুরুষ, কে বেঁচে থাকবে আর কে মরে যাবে, সেটা কে নির্ধারণ করছেন? ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বিচারক নিশ্চয়ই আছেন, যিনি এই ধরনের আদেশগুলি দিচ্ছেন, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রস্তাব, সেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তাটি কে, তা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—"প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে।" (ভগবদ্গীতা ৯/১০)

ডঃ সিং ঃ ডারউইনও বলছেন যে, বিভিন্ন প্রজাতিগুলি একসঙ্গে সৃষ্টি হয়নি, ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ফলে তারা উদ্ভূত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে এই ক্রমবিকাশের পন্থা কি ভাবে শুরু হল, সে সম্বন্ধে তারা কি যুক্তি দেখাচ্ছে?

করন্ধর ঃ ডারউইনের আধুনিক অনুগামীরা বলে যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম জীবনের উদ্ভব হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আর আমি তাদের বলি, "রাসায়নিক পদার্থ থেকেই যদি জীবনের উদ্ভব হয়ে থাকে, এবং তোমরা যদি এত উন্নত বৈজ্ঞানিক হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের রসায়নাগারে জৈব-রসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমরা কেন জীবন সৃষ্টি করতে পারছ না?"

ভবিষ্যতে করব

করন্ধর ঃ তারা বলে যে ভবিষ্যতে তারা জীবন সৃষ্টি করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ভবিষ্যতে করবে? যখন এই প্রশ্নটি তাদের করা হয়, তখন তারা বলে, "ভবিষ্যতে আমরা করব।" তারা ভবিষ্যতের

প্রতিশ্রুতি দেয় কেন? সেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, "Trust no future however pleasant." (ভবিষ্যৎ যতই মধুর হোক্ না কেন, তাকে কখনও বিশ্বাস করো না)। তারা যদি এতই উন্নত হয়, তাহলে এখনই তারা দেখাক্ যে রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করা যায়। তা না হলে তাদের এই উন্নতির অর্থ কি? তারা যা বলছে তা সম্পূর্ণ বাজে কথা।

করন্ধর ঃ তারা বলছে যে, এই তারা জীবন সৃষ্টি করে ফেলল বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটাও একরকম "ভবিষ্যতে করব" বলা। বৈজ্ঞানিকদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জীবনের উৎস সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। ভবিষ্যতে, রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি হয়, সেটা প্রমাণ করবে বলে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিচ্ছে, তা কাউকে একটা Post-dated cheque দেওয়ার মত। ব্যাঙ্কে যদি আমার কোন টাকা না থাকে অথচ আমি যদি তোমাকে ১০,০০০ টাকার একটা Post-dated cheque দিই, তাহলে সেই চেকের কি মূল্য আছে? বৈজ্ঞানিকেরা দাবী করছে যে, তাদের বিজ্ঞান অভ্রান্ত, কিন্তু আমরা যখন তাদের কাছে একটা ব্যবহারিক প্রমাণ দাবী করি, তখন তারা বলে ভবিষ্যতে তারা সেটা দেবে। তুমি যদি আমার কাছে কয়েকটা টাকা চাও, আর তখন যদি আমি বলি, "হ্যাঁ, এখন আমি তোমাকে একটা মস্ত বড় অঙ্কের Post-dated cheque দিচ্ছি," তাহলে সেটা কি ঠিক হবে? তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে তুমি বলবে, "এখন আপনি আমাকে পাঁচটা টাকা দিন, তাহলে আপাতত আমি অন্তত হাতে কিছু পাব।" এখনও বৈজ্ঞানিকেরা তাদের গবেষণাগারে এক টুকরো ঘাসও তৈরী করতে পারেনি, অথচ তারা দাবী করছে যে, রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এটা কি রকম অর্থহীন প্রলাপ? সে সম্বন্ধে কেউ কি কোন প্রশ্ন করছে না?

করন্ধর ঃ তারা বলে যে রাসায়নিক নিয়মের মাধ্যমে জীবনের সৃষ্টি হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যখনই কোন নিয়মের কথা উঠছে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, কেউ নিশ্চয়ই সেই নিয়ম সৃষ্টি করেছে। তাদের তথাকথিত সমস্ত প্রগতি সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা তাদের গবেষণাগারে একটা ঘাস পর্যন্ত তৈরী করতে পারে না। তারা কি রকম বৈজ্ঞানিক?

ডঃ সিং ঃ তারা বলে যে চরম বিশ্লেষণে সবকিছুই জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জীবের উদ্ভব হয়েছে অচেতন জড় পদার্থ থেকে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে এখন এই সচেতন পদার্থ জীব আসছে কোথা থেকে? তাহলে বৈজ্ঞানিকেরা কি-বলতে চায় যে পূর্বে জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু এখন আর হচ্ছে না? এই পিঁপড়েগুলি আসছে কোথা থেকে—একটা আবর্জনার স্তূপ থেকে?

জীবের বিবর্তনধারার লুপ্তরূপ

ডঃ সিং ঃ জড় পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি মতবাদ রয়েছে। সেই মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করছে কি ভাবে জড়ের থেকে জীবের উদ্ভব হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ (ডঃ সিংকে একজন জড় বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় স্থাপন করে) ঠিক আছে বৈজ্ঞানিকমশায়, তাহলে এখন জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হচ্ছে না কেন? এখন তাহলে আপনি জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করছেন না কেন?

প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকগুলি হচ্ছে এক একটি মহামূর্খ। নির্বোধ শিশুর মত তারা বলে যে জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। যদিও সেটা প্রমাণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উচিত এই সমস্ত মূর্খগুলির মুখোশ খুলে দেওয়া। তারা কেবল ধাপ্পা দিয়ে চলেছে। তারা এখনই কেন জীবন সৃষ্টি করছে না?

অতীতে তারা বলেছিল, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, আর এখন তারা বলছে যে ভবিষ্যতে আবার তা হবে। তারা বলে যে জড় পদার্থ থেকে তারা ভবিষ্যতে জীবন সৃষ্টি করবে। এটা কিরকম বৈজ্ঞানিক মতবাদ। তারা পূর্বেই বলেছে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল। তারা বলছে—"হয়েছিল।" তাহলে এখন তারা ভবিষ্যতের অজুহাত দেখাচ্ছে কেন? সেটা কি পরস্পর মতবিরোধী নয়? তারা আশা করছে, অতীতের পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে হবে। এটা হচ্ছে একটা শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা।

করন্ধর ঃ তারা বলছে যে অতীতে জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে তারা সেইভাবেই জীবনের সৃষ্টি করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটা কিরকম নির্বুদ্ধিতা? বর্তমানে, তারা যদি প্রমাণ করতে না পারে যে জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল, তাহলে তারা কিভাবে দাবী করতে পারে যে, অতীতে সেভাবে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল?

ডঃ সিং ঃ তারা অনুমান করছে...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অনুমান যে কেউ করতে পারে, কিন্তু সেটা বিজ্ঞান নয়। সকলেই কিছু না কিছু অনুমান করতে পারে। তুমি কিছু অনুমান করতে পার, আমি কিছু অনুমান করতে পারি। কিন্তু তা যদি প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সেটা বিজ্ঞান নয়। আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, জীবন থেকে জীবনের উদ্ভব হয়। যেমন, একজন পিতার থেকে একটি পুত্রের উদ্ভব হয়। পিতা একটি জীবিত জীব এবং পুত্রও জীবিত। কিন্তু একটা জড় পাথর থেকে একটি মানব শিশুর জন্ম হওয়ার প্রমাণ কোথায়? আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি যে, জীবন থেকে জীবনের উদ্ভব হয়, এবং সমস্ত জীবনের উৎস হচ্ছেন কৃষ্ণ। সেটাও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু একটা পাথর থেকে একটি শিশুর জন্ম

হওয়ার প্রমাণ কোথায়? প্রকৃতপক্ষে তারা প্রমাণ করতে পারে না যে, জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল। সেটা তারা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়েছে। (হাস্য)

করন্ধর ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে তারা এখন অ্যামিনো অ্যাসিডের মত অ্যাসিড তৈরী করতে পারে, যেগুলি হচ্ছে অনেকটা এককোষী প্রাণীর মত। তারা বলে যে, যেহেতু এই অ্যাসিডটির সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে, তাই নিশ্চয়ই তারা জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করতে পারবে, তারা যদি কোনরকমে Missing Link-টি (বিবর্তনের লুপ্ত সূত্রটি) খুঁজে পায়, তাহলেই তারা জীবন সৃষ্টি করতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। Missing Link! আমি তাদের মুখের ওপর সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি! (হাস্য) এই চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের মুখের ওপর আমার এই চ্যালেঞ্জই হচ্ছে তাদের missing Link.

গর্দভের নোবেল পুরস্কার

ডঃ সিং ঃ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আশা করছে যে ভবিষ্যতে তারা টেস্ট-টিউবে সন্তান উৎপাদন করতে সমর্থ হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ টেস্ট-টিউবে?

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ। তারা পুরুষ এবং স্ত্রীর উপাদানগুলির মিশ্রণে গবেষণাগারে সন্তান উৎপাদন করার চেষ্টা করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষ থেকে যদি তাদের মূল উপাদানগুলি গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আর টেস্ট-টিউবের কি প্রয়োজনীয়তা রইল? টেস্ট-টিউবটা হচ্ছে কেবল মিশ্রণ করার জায়গা, মাতৃজঠরও এক-রকমের টেস্ট-টিউব। তাহলে এতে বৈজ্ঞানিকদের কি কৃতিত্ব আছে? প্রকৃতির টেস্ট-টিউবে সেটা ত' প্রতিনিয়তই হচ্ছে।

করন্ধর ঃ প্রকৃতিতে তা ইতিমধ্যেই হচ্ছে, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক যখন সেটা করে, লোকেরা তখন তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে— '*শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।*' অর্থাৎ, যারা পশুর মত মানুষদের প্রশংসা করে, তারা কুকুর, শূকর, উট এবং গাধা থেকে কোন অংশে উন্নত নয়। *শ্ব* মানে হচ্ছে কুকুর, *বিড়্বরাহ* মানে হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী শূকর, *উষ্ট্র* মানে উট এবং *খর* মানে হচ্ছে গাধা। একটা বিকৃত মস্তিষ্ক তথাকথিত বৈজ্ঞানিককে যদি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন বুঝতে হবে, যে নির্বাচকেরা যাকে সেই পুরস্কারটি দিল, তারা কুকুর, শূকর, উট এবং গাধার থেকে কোন অংশে উন্নত নয়। আমরা তাদের মনুষ্য বলে স্বীকার করি না। একটি পশু আর একটি পশুর স্তব করছে, এতে কি কৃতিত্ব রয়েছে? নির্বাচন কমিটির সদস্যরা যদি পশুর থেকে উন্নত না হয়, যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে সে নিশ্চয়ই একটা এক নম্বরের মূর্খ, কেননা পশুরা তার প্রশংসা করছে, মানুষেরা নয়।

ডঃ সিং ঃ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কাছে নোবেল পুরস্কারই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা এক একটা মূর্খ। তারা কতকগুলি অর্থহীন প্রলাপ বকছে, আর তাদের বড় বড় কথা শুনে অন্য সকলে ভুল পথে চালিত হচ্ছে।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ নোবেল হচ্ছে একজন বৈজ্ঞানিক, যে ডায়নামাইট আবিষ্কার করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সে একটা মস্ত বড় অশান্তির সৃষ্টি করেছে, আর তারপর সে তার সমস্ত অর্থ রেখে গেছে, যাতে জগতে আরও অশান্তির সৃষ্টি হয়। (হাস্য)

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে যে, আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের কার্যকলাপের ফলে পৃথিবী ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। *উগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ* (ভগবদ্‌গীতা ১৬/৯)। তাদের কার্যকলাপ অমঙ্গলজনক এবং ধ্বংসাত্মক।

জীব এবং জড়ের পার্থক্য

(শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ছড়ি উঠিয়ে একটি মৃত গাছ দেখালেন।)

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আগে এই গাছটিতে ডালপালা বা পাতা গজাচ্ছিল। কিন্তু এখন আর গজাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে তার বিশ্লেষণ করবে?

করন্ধর ঃ তারা বলবে যে এই গাছটির রাসায়নিক উপাদানগুলির পরিবর্তন হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা যদি তা বলে তাহলে সেটা প্রমাণ করতে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সেই গাছে ইনজেক্ট করে আবার তারা সেই গাছটির ডালপালা এবং পাতা গজাক। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে observation, hypothesis এবং তারপর demonstration (পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প এবং তারপর প্রমাণ প্রদর্শন)। তখনই কেবল সেটা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের গবেষণাগারে প্রমাণ করতে পারছে না যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়। তারা কেবল কতকগুলি জিনিস পর্যবেক্ষণ করে তারপর তাদের মনগড়া কতকগুলি অর্থহীন প্রলাপ বকতে থাকে। তাদের ব্যবহার একটা নির্বোধ শিশুর মত। আমরা ছোটবেলায় একটা গ্রামাফোন দেখে মনে করতাম যে সেই গ্রামাফোনের মধ্যে একটা মানুষ বসে গান গাইছে—একটা ইলেকট্রিকের মানুষ। আমরা মনে করতাম যে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক-মানুষ অথবা একটা ভূত রয়েছে। (হাস্য)।

ডঃ সিং ঃ জীববিজ্ঞানের একটা মস্ত বড় প্রশ্ন হচ্ছে, "জীবিত এবং মৃতের মধ্যে পার্থক্য কি?" পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বলা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে একটি জীবিত প্রাণী স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ করতে পারে এবং বংশরক্ষা করতে পারে, কিন্তু একটি মৃত বস্তু তা পারে না। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলিতে কখনও আত্মার প্রকৃতি অথবা জীবের চেতনা সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হচ্ছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ চেতনাই হচ্ছে জীবনের প্রথম লক্ষণ, চেতনা আছে বলেই একটি জীব স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ করতে পারে এবং বংশরক্ষা করতে পারে। চেতনা আছে বলেই মানুষ বিবাহ করার কথা চিন্তা করতে পারে এবং সন্তান উৎপাদন করতে পারে। আর সেই চেতনার উৎস সম্বন্ধে বর্ণনা করে *বেদে* বলা হয়েছে, *"তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম"* (*ছান্দোগ্যোপনিষদ* ৬/২/৩)। অর্থাৎ, পরম চৈতন্যময় ভগবান বললেন, "আমি বহু হব।" চেতনা না থাকলে বংশবৃদ্ধির কোনরকম সম্ভাবনা থাকে না।

ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মালী সবুজ গাছগুলিতে জল দেয়, তারা মৃত গাছগুলিতে জল দিয়ে সেগুলিকে সবুজ করে না কেন?

ডঃ সিং ঃ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে যে, সেগুলি আর কোনদিনও সবুজ হবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে এতে কিসের অভাব? বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে রাসায়নিক পদার্থগুলিই হচ্ছে জীবনের কারণ। তাহলে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি গাছটির জীবিত অবস্থায় বর্তমান ছিল সেগুলি ত' এখনও রয়েছে। সেই রাসায়নিক পদার্থগুলি এখনও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জীব এবং কীটপতঙ্গের জীবনধারণে সাহায্য করছে। সুতরাং তারা বলতে পারে না যে, গাছটিতে উপাদানের কোন অভাব আছে। রাসায়নিক উপাদান এখনও তাতে রয়েছে।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু সেই গাছটির জীবনীশক্তির কি হল?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে পার্থক্য। সেই জীবনীশক্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত সত্তা। সেই বিশেষ ব্যক্তিগত সত্তাটি, যে সেই গাছটির শরীর ধারণ করেছিল, সে চলে গেছে। সেটাই হচ্ছে তার মৃত্যুর কারণ। তাই যদিও জীবন-ধারণ করার সবকটি রাসায়নিক পদার্থ এখনও সেখানে রয়েছে, তবুও সেই গাছটি মরে গেছে।

এই সম্পর্কে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন ধরুন আমি একটি বাড়িতে কিছুদিন থাকার পরে সেটা ছেড়ে চলে গেলাম। আমি চলে গেলাম, কিন্তু অন্য অনেক জীব সেখানে এখনও থেকে গেল—পিঁপড়ে, আরশোলা ইত্যাদি। সুতরাং কেউ যদি বলে যে, যেহেতু আমি সেই বাড়িটি থেকে চলে গেলাম তাই সেখানে আর কোন প্রাণী থাকবে না, সেটা ঠিক নয়। অন্যান্য অনেক প্রাণী সেখানে থাকতে পারে। কেবল আমি—একটি জীব—চলে গেছি। গাছটির রাসায়নিক উপাদানগুলি হচ্ছে সেই বাড়িটির মত; তা হচ্ছে জড়জগতের কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য আত্মার ব্যক্তিগত সত্ত্বার—পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা দেহ। এক একটি আত্মা এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা। আমি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, আর তাই আমি বাড়িটি ছেড়ে চলে যেতে পারি। তেমনই কীট-পতঙ্গ এবং জীবাণুগুলি হচ্ছে এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা; তাদের স্বতন্ত্র চেতনা রয়েছে। তারা যদি একদিকে চলতে চলতে বাধা পায় তাহলে তারা মনে করে, "এদিকে আমি বাধা পেয়েছি, তাহলে আমি ওদিক দিয়ে যাই।" তাদের ব্যক্তিত্ব রয়েছে—তাদের স্বতন্ত্র চেতনা রয়েছে।

করন্ধর ঃ কিন্তু মৃতদেহের কোন ব্যক্তিত্ব নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এর থেকে বোঝা যায় যে, স্বতন্ত্র আত্মা দেহটি ছেড়ে চলে গেছে। আত্মা সেখান থেকে চলে গেছে আর তাই গাছটির আর কোনরকম বৃদ্ধি হচ্ছে না।

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব রয়েছে, এবং সেই দেহটির মালিক একটি আত্মাও সেখানে রয়েছে। তাই নয় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। আমার এই শরীরে অসংখ্য জীব রয়েছে। আমাদের পেটে অনেক কৃমিকীট রয়েছে। তারা যখন খুব সবল হয়ে ওঠে, তখন আমি যা খাই, তারা সেই খাবার খেয়ে নেয় এবং আমার শরীরের তখন আর কোন পুষ্টি হয় না। তাই যাদের পেটে কৃমি আছে তারা খুব খায় কিন্তু তাদের শরীরের বৃদ্ধি হয় না। তারা একেবারে লিক্‌লিকে রোগা হয়ে যায় এবং সবসময় তারা ক্ষুধার্ত থাকে, কেননা এ সমস্ত ছোট ছোট জীবগুলি তার সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলছে। এইরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জীব আমাদের শরীরে রয়েছে—তারাও এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা, এবং আমিও একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু আমি হচ্ছি এই দেহটির মালিক, ঠিক যেমন আমি একটি বাগানের মালিক হতে পারি, যেখানে লক্ষ লক্ষ জীব বাস করছে।

জনৈক শিষ্য ঃ তাহলে আমি যদি কৃষ্ণপ্রসাদ খাই, তখন কি আমার দেহে বাস করছে যে সমস্ত জীব তারাও সেই প্রসাদ খাচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তুমি খুব পরোপকারী। (হাস্য)। তুমি অন্যের জন্য কৃষ্ণপ্রসাদ খাও।

করন্ধর ঃ সমাজসেবা। (হাস্য)।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমার শরীরে তাদের খাওয়ার মত এত কিছু রয়েছে যে তাদের খাওয়াবার জন্য তোমাকে কোন আলাদা আয়োজন করতে হবে না।

অল্প কথায় অধিক সমাধান

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তার জন্ম নেই, তার মৃত্যু নেই। সে কেবল এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হয়, ঠিক যেমন আমরা আমাদের পোশাক বদল করি। এটাই হচ্ছে যথার্থ বিজ্ঞান।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেটা স্বীকার করে না কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা বুদ্ধিমান নয়। তারা নির্বোধ, মূর্খ। এমনকি তারা ভদ্রলোকও নয়। ভদ্রলোকদের অন্তত একটু লজ্জা থাকে। কিন্তু এই সমস্ত মানুষগুলি সম্পূর্ণ নির্লজ্জ। তারা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু নির্লজ্জের মত তারা দাবী করে যে তারা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক এবং তারা জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করবে। এরা ভদ্রলোক নয়। অন্তত আমি ত' তাই মনে করি। একজন ভদ্রলোক কতকগুলি আবোল তাবোল কথা বলতে লজ্জাবোধ করবে।

ডঃ সিং ঃ কোন কিছু বলার আগে তারা চিন্তা করে দেখে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তার মানে তারা মনুষ্য পর্যায়ভুক্তও নয়। একজন মানুষ কিছু বলার আগে দু'বার চিন্তা করে দেখে। কত সহজভাবে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই দেহে জীবাত্মা আছে বলেই দেহটি কার্যকরী হচ্ছে। তিনি বলেছেন —

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহের মালিক জীবাত্মা যেমন এই দেহে ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন, এবং জরাগ্রস্ত হয়, তেমনই দেহান্তর হলেও দেহীর অস্তিত্বের লোপ হয় না। যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ধীর হয়েছেন, তিনি কখনও এরকম পরিবর্তনে মুহ্যমান হয়ে পড়েন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩)

এই দু'টি লাইনে কৃষ্ণ সবকটি জৈব সমস্যার সমাধান করেছেন। এটাই হচ্ছে জ্ঞান। অল্পকথায় সবকিছুর সমাধান। মোটা মোটা কতকগুলি বইয়ে কতকগুলি অর্থহীন প্রলাপ বকলে তাতে কোন কাজ হবে না। জড় বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে শব্দ করা কতকগুলি ব্যাঙের মত। (শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাঙের ডাকের অনুকরণ করলেন এবং অন্যরা হাসতে লাগল।) ব্যাঙ ভাবছে, "ওঃ, আমি কি সুন্দর সুন্দর সমস্ত কথা বলছি", কিন্তু তার পরিণামে কি হচ্ছে? একটা সাপ তাকে খুঁজে বার করে ভাবছে, "ওঃ, এখানে কি সুন্দর একটা ব্যাঙ!" ব্যাস্, তারপর সেই সাপটা ব্যাঙটাকে গিলে ফেলে। তখন সব শেষ। যখন মৃত্যু আসে তখন সব শেষ হয়ে যায়। জড় বৈজ্ঞানিকেরা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করছে, কিন্তু যখন মৃত্যু আসে তখন তাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি তাদের রক্ষা করতে পারে না। তখন সব শেষ হয়ে যায়। আর তারপর পরবর্তী জীবনে তারা একটা কুকুর অথবা বিড়াল হয়ে জন্ম নেয়।

তৃতীয় প্রাতঃভ্রমণ

২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের শ্যেভিয়ট হিল্‌স্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং,
করন্ধর দাস অধিকারী, এবং অন্য কয়েকজন শিষ্য।

বৈজ্ঞানিক না প্রতারক

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ (হাতে একটা গোলাপ ফুল নিয়ে) কোন বৈজ্ঞানিক কি এইরকম একটা ফুল তার গবেষণাগারে তৈরী করতে পারবে?

ডঃ সিং ঃ না, সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা কখনই সম্ভব নয়। দেখ, কৃষ্ণের শক্তি কি অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করছে! কোন বৈজ্ঞানিক এরকম একটা ফুল তার গবেষণাগারে তৈরী করতে পারে না। এমনকি তারা কয়েক দানা বালিও তৈরী করতে পারে না, অথচ তারা দাবী করছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাদের মত এত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আর কেউ নেই। এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা।

ডঃ সিং ঃ তারা উপাদানগুলি নেয় কৃষ্ণের থেকে, তারপর সেগুলি একটু এদিক-সেদিক করে দাবী করে যে তারা আশ্চর্যজনক কিছু একটা আবিষ্কার করেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা যদি স্বীকার করে যে উপাদানগুলি তারা কৃষ্ণের থেকে নিয়েছে, তাহলেও অন্ততঃ কিছুটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আমরা জানি যে সবকিছুরই উৎস হচ্ছেন কৃষ্ণ—সবকিছুই কৃষ্ণের সম্পত্তি।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু তারা স্বীকার করে না যে তারা কৃষ্ণের থেকে কিছু নিচ্ছে। পক্ষান্তরে তারা বলে যে তারাই সবকিছু সৃষ্টি করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাদের ঐ দাবীর ভিত্তি কি? তারা কি কোনদিনও কোন কিছু সৃষ্টি করেছে? তারা বালি নেয়, তার সঙ্গে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ মেশায় এবং তারপরে কাঁচ তৈরী করে। বালি তারা সৃষ্টি করেনি, আর সেই রাসায়নিক পদার্থগুলিও তারা সৃষ্টি করেনি; সেগুলি তারা প্রকৃতি থেকে নিয়েছে। সুতরাং তারা কি সৃষ্টি করল?

ডঃ সিং ঃ ওরা বলে, "আমরা এই উপাদানগুলি প্রকৃতি থেকে নিয়েছি।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ "প্রকৃতি থেকে" মানেই হচ্ছে কারও থেকে। তারা প্রকৃতি থেকে নিচ্ছে, কিন্তু আসলে সেগুলি তারা চুরি করছে, কেননা প্রকৃতির সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের। *ঈশাবাস্যং ইদং সর্বম্*—"সবকিছুই ভগবানের সৃষ্টি।" (*ঈশোপনিষদ* ১) *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কেউ যদি যজ্ঞ না করে, অর্থাৎ ভগবানের আদেশ না নিয়ে বা ভগবানকে নিবেদন না করে প্রকৃতি থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে সে একটা চোর। 'যজ্ঞ' কথাটির অর্থ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের থেকে যে আমরা গ্রহণ করছি তা স্বীকার করা। আমাদের মনে করা উচিত, "শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমাদের জীবন-ধারণের জন্য কতকিছু দিয়েছ। সে জন্য আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।" শ্রীকৃষ্ণ কেবল এইটুকু স্বীকৃতিই চান; সেটাই যথেষ্ট। তা না হলে আমাদের থেকে আশা করার মত তাঁর আর কি আছে? তাঁর কাছে আমাদের কেবল তাঁর করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাই প্রসাদ পাওয়ার আগে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে তা' নিবেদন করে বলি, "তুমি আমাদের এই সুন্দর সুন্দর খাবারগুলি দিয়েছ, তাই প্রথমে তুমিই এগুলি গ্রহণ করো।" তারপরে আমরা সেটা খাই।

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত নন, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জগৎটা খেয়ে ফেলতে পারেন এবং তারপর তাকে আবার ঠিক যেমনটি তেমন করে তৈরী করতে পারেন। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে* (ঈশোপনিষদ মঙ্গলাচরণ)। শ্রীকৃষ্ণ এত পূর্ণ যে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলেও তাঁর শক্তির কোন ক্ষয় হয় না। পূর্ণশক্তি তাঁর মধ্যে বিরাজমান থাকে। সেটি হচ্ছে যথার্থ শক্তিসংরক্ষণের পূর্ণতা।

প্রকৃতির উৎস

ডঃ সিং ঃ Nature নামক একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা আছে। তাতে গাছপালা, ফুল, ধাতু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ থাকে, কিন্তু সেখানে ভগবানের কোন উল্লেখ করা হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যথার্থই মনে হতে পারে যে, গাছ-পালাগুলি প্রকৃতি থেকে আসছে; কিন্তু তারপর প্রশ্ন থেকে যায়, "প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?" এই প্রশ্নই হচ্ছে যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ডঃ সিং ঃ সেটা তারা সাধারণতঃ চিন্তা করে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে বুঝতে হবে যে তারা নির্বোধ। প্রকৃতি আসছে কোথা থেকে? প্রকৃতির উল্লেখ করলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে, "কার প্রকৃতি?" তাই নয় কি? যেমন, আমি আমার প্রকৃতির কথা বলি, তোমরা তোমাদের প্রকৃতির কথা বল। তাই যখনই প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়, তখনই প্রশ্ন করা উচিত "কার প্রকৃতি?" প্রকৃতি মানে শক্তি। যখনই আমরা শক্তির কথা বলি, তখন আমরা সেই শক্তির উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বাধ্য হই। যেমন, তুমি যদি বৈদ্যুতিক শক্তির কথা বল, তখন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে সেই শক্তির উৎস হচ্ছে Powerhouse। তা তুমি অস্বীকার করবে কি করে? বৈদ্যুতিক শক্তি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয় না। তেমনই, প্রকৃতি আপনা থেকেই কার্যকরী হচ্ছে না; তা কার্যকরী হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায়।

জনৈক শিষ্য ঃ বেদে বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, যখনই তুমি শক্তির কথা বল, সেই শক্তির নিশ্চয়ই একটি উৎস থাকে।

জড়জগতের কুহক

করন্ধর ঃ ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর আবরণ থেকে কিছু ধুলাবালি নিয়ে পরীক্ষা করে পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ নিরূপণ করতে চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু পৃথিবীর আবরণের এই স্তরগুলি প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। এখন তারা একরকম ভাবে রয়েছে, এবং আধ ঘণ্টা পরে তারা ভিন্ন রকম হয়ে যাবে। তাই তাকে বলা হয় জগৎ—সর্বদাই পরিবর্তনশীল। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ*—"এই প্রাকৃত জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল।" (ভগবদ্‌গীতা ৮/৪)। তাই, শক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে পূর্ণ শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর উপরের মাটির স্তর এখন কালো হতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটা সাদাও হয়ে যেতে পারে, তারপরে তা আবার কালো হয়ে যেতে পারে। তাই ভূতত্ত্ববিদেরা তার কালো রং পরীক্ষা করছে, আবার সাদা রং পরীক্ষা করছে, তারপর আবার কালো রং পরীক্ষা করছে। এইভাবে গবেষণা চলছে। একে বলা হয়, *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*—"ছিবড়া চেবানো।" এখন এখানে ঠাণ্ডা, কিন্তু দুপুরবেলা গরম হবে, তারপর রাত্রে আবার ঠাণ্ডা হবে। এইভাবে জড়া প্রকৃতি নিয়তই পরিবর্তনশীল। এমনকি আমাদের শরীরেও পরিবর্তন হচ্ছে। সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পিছনে নিত্যতা কোথায়। সেই নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। সেই নিত্য বস্তুকে বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে পায় না, আর তাই তারা বিফল মনোরথ হয়। তারা মনে করে পরিণামে সবকিছুই শূন্য। তারা মনে

করে অনন্ত হচ্ছে শূন্য। আর কেউ যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে এই শূন্যটি আসছে কোথা থেকে, তখন তারা বলে, "কোন কিছু থেকেই সেটি আসছে না।" তাই আমাদের তাদের জিজ্ঞাসা করতে হয়, "তাহলে এই বৈচিত্র্য এল কি করে?" বেদে বলা হয়েছে যে, বৈচিত্র্য অনন্ত। জড়া প্রকৃতিতে বৈজ্ঞানিকেরা যে বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করছে, তা অনিত্য। এই বৈচিত্র্যগুলি হচ্ছে প্রকৃত বৈচিত্র্যের আভাস। প্রকৃত বৈচিত্র্য অপ্রাকৃত জগতে নিত্য বর্তমান।

ডঃ সিং ঃ তার মানে এই জড় জগতটা হচ্ছে একটি মরীচিকার মত?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা দেখে মনে হয় যে, এখানে জল আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নেই। এটি একটি কুহক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে জল কোথাও না কোথাও রয়েছে, কিন্তু সেই মরীচিকায় জল নেই। তেমনই জড়া প্রকৃতিতে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বৈচিত্র্য—সেটি হচ্ছে মরীচিকার মত। আমরা, জীবেরা প্রকৃতপক্ষে উপভোগের সামগ্রী; কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আমরা যখন উপভোগ করতে চাই—সেটিই হচ্ছে কুহক। আমাদের অবস্থা মরুভূমির পশুদের মত, যারা জল মনে করে মরীচিকার পিছনে ছুটতে থাকে এবং অবশেষে তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করে। তারা কুহকের পিছনে ছুটতে থাকে, কিন্তু তাদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। তেমনই, ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করার জন্য আমরা কতরকমের আয়োজন করার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে আমরা বিফল মনোরথ হচ্ছি, কেননা সেই প্রচেষ্টাটি ভ্রান্ত। তাই আমরা অনুসন্ধান করি, "প্রকৃত সত্য কি? এই কুহকের পিছনে বাস্তব কোথায়?" সেটা যদি আমরা জানতে পারি, তাহলেই আমরা যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

চতুর্থ প্রাতঃভ্রমণ

২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং, ব্রহ্মানন্দ স্বামী,
করন্ধর দাস অধিকারী এবং অন্য কয়েকজন শিষ্য।

গর্দভের প্রগতি

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই জড়জগতে সকলেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, আর বৈজ্ঞানিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করছে, যেখানে দুঃখ-দুর্দশাগুলি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা উন্নতি সাধন করছে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, 'মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা।' —তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকগুলি গাধায় পরিণত হচ্ছে। সে উত্তরোত্তর আরও বেশী করে গাধা হয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, গাধার মত কঠোর পরিশ্রম করে কেউ একটা বড় বাড়ি বানাচ্ছে। সারা জীবন সেজন্য সে হয়ত কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু অবশেষে তাকে মরতে হচ্ছে। এত কঠোর পরিশ্রম করে যে বাড়িটি সে বানাল, সেটিতে সে থাকতে পারে না; জড়া প্রকৃতি তাকে লাথি মেরে সেখান থেকে বার করে দেয়, কেননা জড় অস্তিত্ব অনিত্য। বৈজ্ঞানিকেরা নিরন্তর সমস্ত গবেষণা করে চলেছে, এবং তাদের যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে তারা কি করছে, তারা বলে, "আমরা আগামী দিনের মানুষদের জন্য সমস্ত ভাল ব্যবস্থা করছি—ভবিষ্যতের জন্য।" কিন্তু আমি বলি, "কিন্তু তোমার কি হবে? এই

বড় বড় বাড়ি বানিয়ে তোমার কি লাভ হল? তোমার পরবর্তী জীবনে তুমি যদি একটা গাছ হয়ে জন্মাও, তাহলে আগামী দিনের মানুষদের জন্য এসব করে তোমার কি লাভ হল?" কিন্তু সে হচ্ছে একটা গাধা। তাই সে জানে না যে তাকে দশ হাজার বছর ধরে তার বানানো সেই বড় বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর আগামী দিনের মানুষের জন্যই বা কি করা হচ্ছে? যদি পেট্রোল না থাকে, তাহলে আগামী দিনের মানুষেরা কি করবে? আর সে যদি একটা কুকুর, বেড়াল অথবা একটা গাছ হয়ে জন্মায়, তাহলে আগামী দিনের মানুষেরাই বা তাকে কিভাবে সাহায্য করবে?

বৈজ্ঞানিকদের—এবং সকলেরই—কর্তব্য হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সমন্বিত এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু তা না করে সকলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আরও বেশী করে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। *ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।* এটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি উক্তি (১/৮/৩৫)। এখানে এই একটি পংক্তিতে সমস্ত জড় অস্তিত্বের কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে যথার্থ সাহিত্য। এই একটি পংক্তি হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা করার সমান। এতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে জীব কিভাবে এই জগতে জন্মগ্রহণ করছে, কোথা থেকে আসছে, সে কোথায় যাচ্ছে, তার কার্যকলাপ কি রকম হওয়া উচিত এবং অন্য বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। *ভবেঽস্মিন ক্লিশ্যমানানাম্*—অর্থাৎ, এই জগতে সকলেই সংগ্রাম করে চলেছে। বেঁচে থাকার এই সংগ্রাম কেন? অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্য। আর সেই অজ্ঞানের প্রকৃতিটি কি রকম? *কামকর্মভিঃ*—ইন্দ্রিয়সুখের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হওয়া, অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়া।

জনৈক শিষ্য ঃ তাহলে আমাদের কি বুঝতে হবে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেহের চাহিদাগুলি বেড়ে যাচ্ছে, কেননা বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য কর্ম করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

বাক্‌চাতুরী আর পৃথিবীর সমস্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—'কেউ যখন পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তাঁর সবকিছুই জানা হয়ে যায়।' আমি Ph.D. নই, তবুও আমি বৈজ্ঞানিকদের চ্যালেঞ্জ করতে পারি। কিভাবে? কেননা আমি শ্রীকৃষ্ণকে জানি, যিনি হচ্ছেন পরম সত্য। *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*—'কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন সবচাইতে বড় বিপদও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।' (ভগবদ্‌গীতা ৬/২২)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২২) ঘোষণা করা হয়েছে, *অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্*—'কৃষ্ণভক্তিতেই যে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা, তা সমস্ত মহাপুরুষেরা এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন।' এই ধরনের জ্ঞানেরই প্রয়োজন। কতকগুলি গবেষণা করে, কতকগুলি মতামত খাড়া করে, তারপর পনের বছর পরে যদি আমরা বলি, "না, না, এটা ঠিক নয়—আসলে এটা অন্য জিনিস", তাতে লাভ কি? সেটা বিজ্ঞান নয়—সেটা সম্পূর্ণ ছেলেমানুষী।

ডঃ সিং ঃ এইভাবেই তারা সবকিছু আবিষ্কার করে—গবেষণার দ্বারা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আর তাদের সেই গবেষণার মূল্য কি? সেটি হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে টাকা শোষণ করার একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ তা হচ্ছে প্রবঞ্চনা। বৈজ্ঞানিকেরা বাক্‌চাতুরী করে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, প্লুটোনিয়াম, ফোটন ইত্যাদি

সমস্ত নাম সৃষ্টি করছে, কিন্তু তার ফলে জনগণের কি লাভ হচ্ছে? মানুষেরা যখন এই সমস্ত বাক্যবিন্যাস শোনে, তখন তারা কি বলতে পারে? একজন বৈজ্ঞানিক একটা জিনিষ বিশ্লেষণ করে, তারপর আরেকটা মূর্খ এসে আবার তারই বিশ্লেষণ করে—কিন্তু অন্যভাবে, অন্য শব্দ প্রয়োগ করে। কিন্তু আসল ব্যাপারটির কোন পরিবর্তনই হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে কি প্রগতি হয়েছে? তারা কেবল গণ্ডা গণ্ডা বই প্রকাশ করেছে। এখন পেট্রোলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এটা সৃষ্টি করেছে। আজ যদি পেট্রোল না থাকে তাহলে এই সমস্ত মূর্খ বৈজ্ঞানিকগুলো কি করবে? সে সম্বন্ধে কিছু করতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ।

কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধূলিস্তূপ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এখন ভারতবর্ষে জলাভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সে ব্যাপারে কি করছে? পৃথিবীতে অপর্যাপ্ত জল রয়েছে, তাহলে যেখানে জলের প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে জল নিয়ে আসুক না কেন? তারা জল সেচন করে জল নিয়ে আসুক। কিন্তু তা না করে তারা চাঁদে যাচ্ছে সেই ধুলাচ্ছন্ন গ্রহ উর্বর করে তুলতে। তারা এই গ্রহটিকেই প্রথম উর্বর করছে না কেন? সমুদ্রে অপর্যাপ্ত জল রয়েছে, তাহলে তারা সাহারা মরুভূমি অথবা আরবের মরুভূমি অথবা রাজস্থানের মরুভূমিতে জলসেচন করছে না কেন? "হ্যাঁ", তারা বলে, "আমরা চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতে তা হবে।" গর্বভরে তারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি।" *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, কেউ যখন তার অপর্যাপ্ত কামনাবাসনাগুলি চরিতার্থ করার অনর্থক প্রয়াসে লিপ্ত হয়, তখন তার বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় *(কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ)*। তাদের চাঁদে যাওয়ার এই প্রচেষ্টা ছেলেমানুষী

ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের চাঁদে যাওয়ার বাসনা একটি ক্রন্দনরত শিশুর আবদারের মত। শিশু কেঁদে বলে, "মা, আমাকে চাঁদটা এনে দাও।" আর মা সেই শিশুটিকে একটা আয়না দিয়ে বলেন, "এই নাও, চাঁদ এনে দিয়েছি।" শিশুটি তখন আয়নাতে চাঁদ দেখে মনে করে "ওঃ, আমি চাঁদ পেয়ে গিয়েছি।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি কেবল মাত্র একটি গল্প নয়।

করন্ধর ঃ এত টাকা খরচ করে চাঁদে গিয়ে সেখান থেকে কতকগুলো পাথরের টুকরো নিয়ে এসে চন্দ্রাভিযানের বৈজ্ঞানিকেরা এখন ঠিক করেছে যে, সেখানে তাদের করণীয় আর কিছু নেই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ এখন তারা অন্য কোন গ্রহে যেতে চায়, কিন্তু তাদের টাকা কম পড়ে গেছে। অন্য গ্রহে যেতে হলে কোটি কোটি ডলার লাগবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ জনসাধারণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, আর সরকার তাদের থেকে কর আদায় করে অনর্থক সেই টাকাগুলি খরচা করছে। জনসাধারণের অতি কষ্টে অর্জিত টাকা এরকম মূর্খের মত অপব্যয় করার কোন যুক্তি নেই। এখন নেতারা আর একটা ধাপ্পার অবতারণা করেছে, "কিছু ভেব না, আমরা অন্য আর একটি গ্রহে যাচ্ছি। এখন আমরা সেখান থেকে আরও বেশী ধূলো নিয়ে আসব। এখন আমরা কয়েক টন ধূলো নিয়ে আসব। হ্যাঁ, কয়েক টন ধূলো।"

ডঃ সিং ঃ তাদের বিশ্বাস যে, মঙ্গল গ্রহে জীব থাকতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তাতে কি আসে যায়? এখানে জীবন রয়েছে, কিন্তু মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে। সুতরাং, ধরা যাক মঙ্গল গ্রহে জীবন রয়েছে—নিঃসন্দেহে সেখানে জীবন রয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি হবে?

ডঃ সিং ঃ সেখানে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে জানতে মানুষ আগ্রহী।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তার মানে তাদের এই ছেলেমানুষী কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাদের এই কোটি কোটি টাকা খরচা করতে হবে। মজা দেখ। আর তাদের যখন কোন দরিদ্র দেশকে সাহায্য করার কথা বলা হয়, তখন তারা বলে, "না, না, আমাদের টাকা নেই।"

সাংখ্য-দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি কি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য-দর্শন দুরকম—প্রাচীন সাংখ্য-দর্শন, যা ভগবানের অবতার কপিলদেব শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং আধুনিক সাংখ্য-দর্শন, যা নাস্তিক কপিল প্রবর্তন করে গেছে। ভগবানের অবতার কপিলদেব প্রবর্তিত সাংখ্য-দর্শনের শিক্ষা হচ্ছে, কি ভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের অনুসন্ধান করতে হয়। এই সাংখ্য প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তি। কিন্তু আধুনিক সাংখ্য-দর্শন কেবল জড় জগতের বিভিন্ন উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করে। সেদিক দিয়ে এটি ঠিক আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত। সাংখ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে গণনা করা। আমরাও একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সাংখ্য দার্শনিক। কেননা, আমরা জড় উপাদানগুলির গণনা করি—এটি ভূমি, এটি জল, এটি আগুন, এটি বায়ু, এটি আকাশ। তা ছাড়াও আমরা মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানেরও গণনা করে থাকি। কিন্তু অহংকারের ঊর্ধ্বে আর গণনা করা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অহংকারের ঊর্ধ্বেও আরও কিছু রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে জীবনী-শক্তি। সে কথাটি কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা জানে না। তারা মনে করে যে, জীবন হচ্ছে কেবল কতকগুলি জড় উপাদানের সমন্বয় মাত্র। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ

তা অস্বীকার করেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"এই নিকৃষ্ট প্রকৃতির ঊর্ধ্বে (ভূমি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) আমার একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি রয়েছে। সেই শক্তি থেকে নিঃসৃত হয়ে সমস্ত জীব এই জড় জগতকে চৈতন্যবিশিষ্ট করেছে।" (ভঃ গীঃ ৭/৫)

ডঃ সিং ঃ আধুনিক সাংখ্য-দর্শনে কি নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট এই দুটি প্রকৃতিরই অনুসন্ধান করা হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। আধুনিক সাংখ্য-দর্শনে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হয় না। তারা কেবল জড় উপাদানগুলিরই বিশ্লেষণ করে, ঠিক যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা করছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যেমন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, সাংখ্য দার্শনিকেরাও তেমন আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ডঃ সিং ঃ যে সমস্ত জড় পদার্থ থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তারা কি সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ জড় পদার্থ থেকে সৃষ্টির প্রকাশ হয় না। আত্মাই কেবল সৃষ্টি করতে পারে। জড় পদার্থ থেকে কখনও জীবনের সৃষ্টি হয় না, এবং জড় পদার্থ থেকে জড় পদার্থেরও সৃষ্টি হয় না। তুমি একজন সচেতন জীব, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে জল সৃষ্টি করতে পার। কিন্তু জড় পদার্থের সেরকম কিছু সৃষ্টি করার শক্তি নেই। তুমি যদি এক বোতল অক্সিজেনের পাশে এক বোতল হাইড্রোজেন রাখ, তাহলে কি তারা তোমার সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজেই মিশ্রিত হতে পারবে?

ডঃ সিং ঃ না, তাদের মিশ্রণ করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে কৃষ্ণের নিকৃষ্ট শক্তি, কিন্তু তুমি কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট শক্তি, তাদের মিলন ঘটাতে পার এবং তার ফলে জল তৈরী করতে পার।

প্রত্যক্ষ কারণ এবং পরোক্ষ কারণ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ উৎকৃষ্ট শক্তির সাহায্য ব্যতীত নিকৃষ্ট শক্তি কার্যকরী হতে পারে না। (প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে) এই সমুদ্র এখন শান্ত এবং স্থির, কিন্তু উৎকৃষ্ট শক্তি বায়ু যখন তাকে ধাক্কা দেয় তখন ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট শক্তি বায়ুর সাহায্য ব্যতীত সমুদ্রের গতিশীল হওয়ার কোন শক্তি নেই। তেমনই বায়ুর থেকেও উৎকৃষ্ট শক্তি রয়েছে, তার থেকেও উৎকৃষ্ট শক্তি রয়েছে। এইরকম ভাবে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর শক্তি এবং চরমে আমরা সমস্ত শক্তির উৎকৃষ্টতম শক্তিরূপে কৃষ্ণকে খুঁজে পাই। সেটিই হচ্ছে যথার্থ অনুসন্ধান। সেটিই হচ্ছে যথার্থ গবেষণা।

একজন ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে ট্রেন চালান, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেইভাবে এই জড়-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনটি চালান, তা একটি রেলের বগি টানে, সেটি আবার অন্য আর একটি বগিকে টানে, এইভাবে সমস্ত ট্রেনটি গতিশীল হয়। তেমনই, এই সৃষ্টিতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রথম ধাক্কাটি দেন, তারপর ক্রমান্বয়ে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয় এবং কার্যকরী হয়। তা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্*—"এই জড় প্রকৃতি আমার পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং স্থাবর ও জঙ্গম সবকিছু প্রকাশ করছে।" আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে (১৪/৪) কৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয় সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়, এই প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে এবং আমিই হচ্ছি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" যেমন, আমরা যদি একটি বট বৃক্ষের বীজ বপন করি, অবশেষে তা একদিন এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় এবং তার থেকে কোটি কোটি নতুন বীজ সৃষ্টি হয়, এবং সেই বীজগুলিও আবার কোটি কোটি বীজ সমন্বিত এক একটি মহীরুহ সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে আদি বীজ প্রদানকারী পিতা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুরই পরম কারণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈজ্ঞানিকেরা কেবল আপাত কারণটিই দর্শন করে; তারা পরোক্ষ কারণ বুঝতে পারে না। *বেদে* শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*সর্বকারণ কারণম্*, অর্থাৎ, সমস্ত কারণের পরম কারণ। কেউ যখন সমস্ত কারণের পরম কারণকে জানতে পারে, তখন তার সবকিছুই জানা হয়ে যায়। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—"কেউ যদি আদি কারণটি জানতে পারে, তখন আনুষঙ্গিক কারণগুলি আপনা থেকেই জানা হয়ে যায়।" বৈজ্ঞানিকেরা যদিও মূল কারণের অনুসন্ধান করছে, কিন্তু পূর্ণতম জ্ঞান সমন্বিত *বেদ* যখন পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কারণের মূল কারণ বলে ঘোষণা করছে, তখন সেই বৈজ্ঞানিকেরা তা স্বীকার করে না। তারা কেবল তাদের সীমিত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে থাকে। সেটিই হচ্ছে তাদের রোগ।

জগৎরূপী যন্ত্র

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈজ্ঞানিকেরা জানে না যে দুরকমের শক্তি রয়েছে—নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট—যদিও তারা প্রতিদিনই সেই দুটি শক্তিকে নিয়েই

কাজ করছে। জড় শক্তি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হতে পারে না। তাকে প্রথম উৎকৃষ্ট চৈতন্য-শক্তির সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই এটা কি করে স্বীকার করা সম্ভব যে এই জড় জগৎ, যা জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয় তা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে? যেমন একটি অতি উন্নত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথাই ধরা যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন মানুষ তার বোতামটা টিপছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কার্যকরী হতে পারে না। ক্যাডিলাক একটা সুন্দর গাড়ি। কিন্তু তার যদি কোন চালক না থাকে তাহলে সেটা কি কোন কাজে আসে? ঠিক তেমনই এই জড় ব্রহ্মাণ্ডও হচ্ছে একটি যন্ত্র। সাধারণতঃ মানুষ নানারকম কলকব্জা সমন্বিত একটা বড় মেশিন দেখে খুব আশ্চর্য হয়, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষ জানেন যে সেই যন্ত্রটি যতই আশ্চর্যজনক হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন চালক এসে তার বোতাম টিপে সেটা না চালাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং কার গুরুত্ব বেশী—যন্ত্র চালকের না যন্ত্রের? তাই আমরা জড় যন্ত্র—এই জড় জগৎ সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে তার চালক কৃষ্ণের সম্বন্ধে আগ্রহী হই। এখন আপনি বলতে পারেন, "বেশ, কিন্তু তিনি যে চালক তা আমি বুঝব কি করে?" শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্*—"আমার পরিচালনায় এই জড়া-প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে।" কিন্তু আপনি যদি বলেন, "না, শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের পরিচালক নন", তাহলে আপনাকে অন্য কোন পরিচালকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে এবং তিনি যে কে তা আপনাকে দেখাতে হবে। কিন্তু তা আপনি পারেন না। তাই আপনার কাছে যখন কোনও প্রমাণ নেই, তাই আপনাকে আমার প্রমাণটিই মেনে নিতে হবে।

পঞ্চম প্রাতঃভ্রমণ

৩রা মে, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

অদৃশ্য পরিচালক

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই জগতে প্রায় সকলেই ভ্রান্তিবশতঃ মনে করছে যে, জড় পদার্থ থেকে তাদের জন্ম হয়েছে। এই নির্বোধ মতবাদটির প্রতিবাদ না করে আমরা পারি না। জড়ের থেকে কখনই জীবনের উদ্ভব হয় না। পক্ষান্তরে জীবন থেকেই জড়ের প্রকাশ হয়। এটা একটা মতবাদ নয়, এটা বাস্তব সত্য। আধুনিক বিজ্ঞান একটা ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই তার সমস্ত বিচার এবং সিদ্ধান্তগুলিও ভ্রান্ত, আর সেই জন্যই মানুষ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। যখন আধুনিক বিজ্ঞানের এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদগুলির সংশোধন করা হবে, তখনই কেবল মানুষ সুখী হতে পারবে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের চ্যালেঞ্জ করে তাদের ভুলগুলো তাদের দেখিয়ে দেওয়া, তা না হলে তারা সমস্ত সমাজটাকে ভুল পথে চালিত করবে। জড় পদার্থের পরিবর্তনের ছটি পর্যায় আছে—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থায়িত্ব, উৎপাদন, হ্রাস এবং মৃত্যু। কিন্তু জড়ের মধ্যে জীবনের যে উৎস—চিন্ময় আত্মা—সে নিত্য; তার এরকম কোন পরিবর্তন হয় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জীব বর্ধিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কেবল তার জড় দেহটির ছটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে যখন সে আর এই জড় দেহটির ভার বইতে পারে না, তখন সে সেটি পরিত্যাগ করে। তারই নাম মৃত্যু। পুরান শরীরের যখন মৃত্যু হয়, আত্মা তখন একটি নতুন

শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের কাপড় পুরান হয়ে গেলে আমরা যেমন তা পরিবর্তন করি, তেমনই একদিন যখন দেহটা পুরান এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন সেটি ছেড়ে দিয়ে আমরা নতুন একটি শরীর ধারণ করি।

ভগবদ্‌গীতায় (২/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহ যেমন ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন আদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জরাগ্রস্ত হয়, অথচ দেহীর অর্থাৎ দেহের মালিক আত্মার কোনরকম বিকার বা পরিবর্তন হয় না, তেমনই দেহান্তর হলেও দেহীর বিনাশ হয় না।" আর তারপরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলছেন—*অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—অর্থাৎ, বিনাশ হয় দেহের, দেহের যে মালিক আত্মা, তার কখনও বিনাশ হয় না। সে অবিনশ্বর এবং নিত্য। জড় দেহ নশ্বর কিন্তু এই দেহের যে আত্মা, সে নিত্য।

এই আত্মার প্রভাবেই সবকিছু কার্যকরী হয়। এই প্রশান্ত মহাসাগরে এই বিরাট বিরাট ঢেউগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রাণশক্তির প্রভাবে। (উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা এরোপ্লেনের দিকে দেখিয়ে) এই এরোপ্লেনটা আকাশে উড়ছে, কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে যে কারোর পরিচালনা ছাড়াই এটা আকাশে উড়ছে?

ডঃ সিং ঃ অবশ্যই কেউ সেটাকে পরিচালনা করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সবকিছুই কারো না কারো পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে এই মূর্খ বৈজ্ঞানিকগুলি কেন তা অস্বীকার করছে? এরোপ্লেনটা একটা মস্ত বড় যন্ত্র, কিন্তু তা একটি ক্ষুদ্র চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, পাইলটের পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করতে

পারে না যে, এই বিরাট 'বোয়িং ৭৪৭' এরোপ্লেনটি একটি ক্ষুদ্র চিৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্য ছাড়াই আকাশে উড়তে পারে। একটি ক্ষুদ্র চিৎ-স্ফুলিঙ্গ যদি এই বিরাট একটি এরোপ্লেনকে পরিচালনা করতে পারে, তাহলে এক বিরাট চিৎ-স্ফুলিঙ্গ যে সমস্ত জড়-প্রকৃতিকে পরিচালিত করতে পারেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে?

প্রকৃত সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়া

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* বলা হয়েছে—

কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশঃ সাদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্ম-স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, আত্মার আয়তন হচ্ছে কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র—অণুসদৃশ। কিন্তু এই অণুসদৃশ চিন্ময় শক্তিটি আছে বলেই আমার দেহটি সক্রিয় হয়েছে। অণুসদৃশ চিন্ময় শক্তি আমার দেহে আছে বলেই দেহটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং ঠিক একই কারণে এরোপ্লেনটি আকাশে উড়ছে। এটা বোঝা কি খুব কঠিন?

কোন লোক হয়ত নিজেকে খুব শক্তিশালী এবং সবল বলে মনে করে। কেন সে শক্তিশালী এবং সবল? তার একমাত্র কারণ, তার ভিতরে একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গ রয়েছে। যে মুহূর্তে অতি ক্ষুদ্র, অণুসদৃশ চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি দেহ থেকে চলে যায়, তখনই তার সমস্ত শক্তি লোপ পায়, এবং তখন কুকুর-শৃগালেরা এসে তার সেই শরীরটা খেতে থাকলেও তার আর কিছু করার উপায় থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা যদি বলে যে, জড় পদার্থ হচ্ছে জীবন সৃষ্টির কারণ, তাহলে আমরা তাদের অনুরোধ করব, অন্ততঃ একজন মৃত মানুষকে তারা বাঁচিয়ে তুলুক; অন্ততঃ আইনস্টাইনের মত একজন মহান ব্যক্তিকে তারা বাঁচিয়ে তুলুক

তো। একটি মৃতদেহের শরীরে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ইন্‌জেকশন করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করুক, যাতে সেই দেহটি আবার সক্রিয় হতে পারে। কিন্তু তারা সেটা করতে পারে না। সেই বিষয়ে তারা কিছুই জানে না, কিন্তু তবুও তাদের বলা হচ্ছে 'বৈজ্ঞানিক'।

ডঃ সিং ঃ সমস্যাটা যখন অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে, তখন তারা সেটা অত্যন্ত হালকাভাবে নিতে চেষ্টা করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। একটা বাঁদর যখন একটা বাঘের সম্মুখীন হয়, তখন সে তার চোখ বন্ধ করে মনে করে, যেহেতু সে বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছে না, সুতরাং সেখানে কোন বাঘ নেই। কিন্তু বাঘটা তৎক্ষণাৎ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। তেমনই বৈজ্ঞানিকেরা যখন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তখন তারাও বাঁদরের চোখ বন্ধ করে রাখার মত সেই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, সেটাই তারা করছে। কেননা আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু সম্বন্ধে সেই সমস্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা কিছুই বলতে চায় না। যা তারা বলে, তা অত্যন্ত হালকা ধরনের। কেননা, মৃত্যুর হাত থেকে তারা কাউকে রক্ষা করতে পারে না। আমরা মরতে চাই না, আমরা বৃদ্ধ হতে চাই না, এবং আমরা রোগগ্রস্ত হতে চাই না। কিন্তু সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের কি সাহায্য করতে পারে? তারা সে সম্বন্ধে কিছুই করতে পারে না। তাই এই সমস্ত জটিল সমস্যাগুলি তারা এড়িয়ে যাচ্ছে।

শৃগাল রাজা

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বাংলায় শৃগাল রাজার একটা গল্প আছে। একটা শৃগালের বনের রাজা হওয়ার গল্প। শৃগালের চতুরতার কথা সকলেই জানে। একদিন একটা শৃগাল একটা গ্রামে এসে ধোপার নীলের গামলায় পড়ে

যায়। তার ফলে তার গায়ের রং হয়ে গেল নীল। সে যখন জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশুরা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "এ কে? এই অদ্ভুত জীবটি কে?" সিংহ পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল—"আপনাকে ত' আমরা এর আগে কখনও দেখি নি। আপনি কে?" শৃগাল তখন উত্তর দিল, "আমি ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছি।" তখন সকলে তাকে ভগবানের মত পূজা করতে লাগল। কিন্তু একদিন রাত্রে যখন কয়েকটি শৃগাল ডাকতে শুরু করল, "হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া!" তখন সেই নীল শৃগালটিও তার প্রবৃত্তি সংবরণ করতে না পেরে ডাকতে শুরু করল, "হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া।" এইভাবে সমস্ত পশুদের কাছে সে ধরা পড়ে গেল যে সে একটা শৃগাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরকম অনেক শৃগাল রাজনৈতিক নেতা আজকাল দেখা যায়। তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের অনেকেই গদিচ্যুত হয়েছে অথবা গ্রেপ্তার হয়েছে।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ কয়েক বছর আগে এখানে (আমেরিকায়) 'ওয়াটারগেট স্ক্যাণ্ডাল' নামক একটা মস্ত বড় রাজনৈতিক শঠতা ধরা পড়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সত্যি কথা বলতে কি এখন কোন সচ্চরিত্র সম্পন্ন মানুষ রাজনীতিতে প্রবেশ করে না। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে অসচ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত না হলে এখনকার দিনে রাজনীতি করা যায় না। তাই কোন সম্ভ্রান্ত মানুষ আজ রাজনীতিতে প্রবেশ করছে না। কিন্তু কি করা যাবে?

ডঃ সিং ঃ রাজনীতিবিদেরাই হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রতারক।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, ওরা এক-একটা দুর্বৃত্ত। একজন দার্শনিক বলেছেন দুর্বৃত্তদের অন্তিম আশ্রয় হচ্ছে রাজনীতি।

বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে মৃত্যুকে রোধ করা

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ বৈজ্ঞানিকেরা কি জানে কেন ক্যান্সার হয়?

ডঃ সিং ঃ ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে তাদের কতকগুলি মতবাদ রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি ক্যান্সারের কারণ জানতে পার, কিন্তু তাতে লাভ কি? এমন কি তুমি যদি ক্যান্সার সারাতেও পার, তাহলেই কি মানুষ চিরকাল বাঁচতে পারবে? না, সেটা সম্ভব নয়। ক্যান্সার হোক্ বা না হোক্, মানুষকে মরতে হবেই। সে মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। ক্যান্সার না হলেও কোন না কোন ভাবে মৃত্যু হবেই। একজন সুস্থ সবল মানুষ হঠাৎ দুর্ঘটনা হয়ে তিন মিনিটের মধ্যেই মারা গেল, এরকম ত' আমরা প্রতিনিয়তই হতে দেখছি। মৃত্যুকে রোধ করাই যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেটাই হচ্ছে যথার্থ বিজ্ঞান, এবং সেই বিজ্ঞান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। শুধু কতকগুলি ঔষধ তৈরী করে রোগ সারানোটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে সবরকম রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে, জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি হচ্ছে সমস্ত দুঃখের কারণ। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন...*"এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মালোক থেকে শুরু করে পাতাললোক পর্যন্ত সর্বত্রই জন্ম এবং মৃত্যু রয়েছে এবং সেইজন্য সকলেই দুঃখ পাচ্ছে।" এই জন্ম-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, যা আমরা নিজেরা অনুশীলন করছি এবং সকলকে যথার্থ আনন্দ লাভ করার জন্য তা অনুশীলন করতে আবেদন করছি। এই দেহটি যখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে এবং আমরা যখন এই দেহটি ত্যাগ করব, তখন তা অনুশীলনের ফলে আমাদের আর জড় শরীর ধারণ করতে হবে না—তখন আর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কবলগ্রস্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে না। সেটাই হচ্ছে যথার্থ বিজ্ঞান।

ষষ্ঠ প্রাতঃভ্রমণ

৭ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং
ব্রহ্মানন্দ স্বামী এবং অন্য কয়েকজন শিষ্য।

অলৌকিক শক্তি থেকে রাসায়নিক পদার্থ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, "এই রাসায়নিক পদার্থগুলি এল কোথা থেকে?" জীবন থেকেই রাসায়নিক পদার্থগুলি আসে, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, জীবনের অলৌকিক শক্তি রয়েছে। যেমন ধর, একটা কমলা লেবুর গাছে কমলা ফলেছে, এবং প্রতিটি কমলা লেবুতে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে—সাইট্রিক অ্যাসিড এবং অন্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ। তাহলে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি এল কোথা থেকে? সেগুলি নিশ্চয় এসেছে গাছের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি রয়েছে তার থেকে। রাসায়নিক পদার্থগুলির উৎস যে কি, তা বৈজ্ঞানিকেরা জানে না। রাসায়নিক পদার্থ থেকে তারা তাদের অনুসন্ধান শুরু করছে, কিন্তু রাসায়নিক পদার্থের উৎস যে কি, সে সম্বন্ধে তাদের কোনই জ্ঞান নেই।

রাসায়নিক পদার্থগুলি আসে জীবনের পরম উৎস—ভগবান থেকে। একটা মানুষের জীবন্ত শরীর যেমন নানারকম রাসায়নিক উপাদান তৈরী করে, জীবনের পরম উৎস (পরমেশ্বর ভগবান) তেমন এই প্রকৃতির সব কটি রাসায়নিক উপাদান তৈরী করেছেন। জলে, স্থলে, মানুষে,

পশুতে পৃথিবীর সর্বত্র রাসায়নিক পদার্থ দেখা যায়, এবং সে সবই ভগবানের তৈরী। তাকে বলা হয় অচিন্ত্য শক্তি। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি যদি স্বীকার না করা হয়, তাহলে জীবনের উৎস সম্বন্ধীয় সমস্যার কোনরকম সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডঃ সিং ঃ এর উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলবে যে, তারা অচিন্ত্য বা অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস করে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু রাসায়নিক পদার্থগুলির উৎস যে কি, তা তো তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। যে কেউই দেখতে পারে যে, একটা সাধারণ গাছ কত রকমের সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করছে। তারা কিভাবে সেগুলি তৈরী করে? বৈজ্ঞানিকেরা যখন তার উত্তর দিতে পারে না, তখন তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, জীবের অলৌকিক শক্তি রয়েছে। আমার আঙ্গুল থেকে নখগুলি যে কি ভাবে বর্ধিত হচ্ছে, তা আমি বিশ্লেষণ করতে পারি না; এটা আমার মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার অতীত। পক্ষান্তরে বলা যায়, অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আমার নখগুলি বর্ধিত হচ্ছে। সুতরাং একজন মানুষের যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকে, তাহলে কল্পনা করে দেখ ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি কেমন।

ভগবান এবং আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, যদিও আমার মধ্যে গুণগতভাবে ভগবানেরই মত শক্তি রয়েছে, কিন্তু আমি কেবল অল্প পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করতে পারি, আর তিনি অপরিমিতভাবে তা তৈরী করতে পারেন। ঘাম রূপে আমি কয়েক ফোঁটা জল তৈরী করতে পারি, কিন্তু ভগবান সমুদ্র তৈরী করতে পারেন। সমুদ্রের একবিন্দু জল বিশ্লেষণ করে যেমন আমরা সমুদ্রের জলের গুণগুলি অভ্রান্ত ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি, তেমনই জীবের গুণাবলী বিশ্লেষণ করে আমরা ভগবানকে বুঝতে পারি, কেননা জীব

হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের মধ্যে অসীম অলৌকিক শক্তি রয়েছে। ভগবানের অলৌকিক শক্তি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করছে, ঠিক একটা বৈদ্যুতিক মেশিনের মত। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে অনেক মেশিন চলে, এবং তাদের এত নিপুণতার সঙ্গে তৈরী করা হয়েছে যে, কেবল একটি বোতাম টিপে সেগুলি চালানো যায়। তেমনই, ভগবান বললেন, "সৃষ্টি হোক্", এবং তার ফলে সবকিছুর সৃষ্টি হল। এইভাবে বিবেচনা করলে, প্রকৃতির কার্যকলাপ বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়। ভগবানের শক্তি এতই অদ্ভুত যে, কেবলমাত্র তাঁর আদেশের ফলে তৎক্ষণাৎ সবকিছুর সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঃ অনেক বৈজ্ঞানিক ভগবান বা অচিন্ত্য শক্তিকে বিশ্বাস করে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা তাদের মূর্খতা। ভগবান আছেন এবং তার অচিন্ত্য শক্তিও আছে। একটা পাখীর আকাশে ওড়ার ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? তুমি এবং একটি পাখী উভয়েই জীব, কিন্তু পাখী উড়তে পারে তার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, আর তুমি তা পার না। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, রক্ত থেকে বীর্য তৈরী হয়। একজন পুরুষের শরীরে অলৌকিক শক্তি রয়েছে, যার ফলে তার মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা দেখা যায়—রক্ত বীর্যে রূপান্তরিত হয়। অলৌকিক শক্তি না থাকলে সেটা কি করে সম্ভব? জীবের মধ্যে এইভাবে নানারকম অলৌকিক শক্তি দেখা যায়। গরু ঘাস খেয়ে দুধ উৎপাদন করে। সেটা সকলেই জানে, কিন্তু তুমি কি কতকগুলি ঘাসকে দুধে রূপান্তরিত করতে পারবে? পারবে না। সুতরাং গরুর মধ্যে অলৌকিক শক্তি রয়েছে। ঘাস খেয়েই গরু সেটাকে দুধে রূপান্তরিত করছে। একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষ প্রায় একইরকম, কিন্তু একজন পুরুষ তার খাদ্যকে দুধে রূপান্তরিত করতে পারে না, কিন্তু একজন স্ত্রী তা পারে। এগুলিই অলৌকিক শক্তি।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলবে যে, বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন রকমের 'এন্‌জাইম' অথবা রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে এবং তার ফলে এই সমস্ত রূপান্তর হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু এই এনজাইমগুলিকে সৃষ্টি করা বা তার আয়োজন করা—এগুলো কে করল? এ সবই হয়েছে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে। তুমি এই এনজাইমগুলি তৈরী করতে পার না অথবা এই আয়োজনও করতে পার না। তোমার গবেষণাগারে তুমি কতকগুলি শুকনো ঘাস থেকে দুধ তৈরী করতে পার কি? তোমার শরীরে, অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তুমি খাদ্যকে রক্তে পরিণত করতে পার, কিন্তু তোমার গবেষণাগারে অলৌকিক শক্তি ব্যতীত তুমি একটিও ঘাসকে দুধে পরিণত করতে পার না। তাই এই অলৌকিক শক্তিকে তোমার মেনে নিতেই হবে।

অলৌকিক শক্তির উৎস

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যোগীরা বিভিন্ন রকমের অলৌকিক শক্তি লাভ করার চেষ্টা করে। একজন যোগী জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কার্যকরী হয় না। এই ধরনের অলৌকিক শক্তিকে বলা হয় 'লঘিমা'। 'লঘিমা' মানে হচ্ছে একজন মানুষ তুলোর থেকেও হাল্‌কা হয়ে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ব্যাহত করতে পারে। যে অচিন্ত্য শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে, যোগ অভ্যাসের ফলে তার প্রকাশ হয়। (সমুদ্রে ক্রীড়ারত কতকগুলি ছেলেকে দেখিয়ে) এই ছেলেগুলি সাঁতার কাটছে, কিন্তু আমি সাঁতার কাটতে পারি না। কিন্তু সাঁতার কাটার ক্ষমতা আমার মধ্যে রয়েছে; আমাকে কেবল অভ্যাস করে সেটা আয়ত্ত করতে হবে। তেমনই মানুষের যদি এত সমস্ত

যৌগিক শক্তি থাকতে পারে, তাহলে একবার ভেবে দেখ ভগবানের যোগ-শক্তি কি রকম। বৈদিক শাস্ত্রে তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, অর্থাৎ "সমস্ত যৌগিক শক্তির তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর।" *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি হচ্ছি জড় এবং চেতন সবকিছুরই উৎস। আমার থেকেই সবকিছুর প্রকাশ হয়।" ভগবানের এই উক্তি যদি আমরা মেনে না নিই, তাহলে জড় প্রকৃতির উৎস সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারব না। তাঁর অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করে নিলে ভগবানকে জানা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তুমি যদি ভগবানকে জানতে পার, তাহলে তুমি সবকিছুই জানতে পারবে।

ডঃ সিং ঃ তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু হয়েছে একটি মধ্যবর্তী স্তর থেকে—মূল উৎস থেকে নয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। উৎস সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বৈজ্ঞানিকেরা একটা মধ্যবর্তী স্তর থেকে তাদের গবেষণা শুরু করে—কিন্তু সেটির উৎস কোথায়? তাদের এত সমস্ত গবেষণা সত্ত্বেও সেটা তারা জানে না। সমস্ত অলৌকিক শক্তি এবং সবকিছু যাঁর থেকে প্রকাশিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানই যে সবকিছুর উৎস, সেটা মেনে নিতেই হবে। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"জড় এবং চেতন সবকিছুরই উৎস হচ্ছি আমি। সবকিছু আমার থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।" আমরা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত করছি না; আমরা যা বলছি, সেটা যথার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জীবন থেকে জড়ের উদ্ভব হয়। জীবনে—উৎসের মধ্যে—অনন্ত সমস্ত জড় পদার্থের প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে; সেটাই হচ্ছে সৃষ্টির সবচাইতে বড় রহস্য।

তুমি যদি একটা ছুঁচ ফেল, তাহলে সেটা তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যাবে, কিন্তু তার থেকে অনেক ভারী যে একটা পাখী সেটা স্বচ্ছন্দে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এইভাবে আকাশে ভাসার ক্ষমতা তার মধ্যে এল কোথা থেকে, সেটা তোমাকে বিচার করে দেখতে হবে। তুমি যদি প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ কর, তাহলে দেখবে যে প্রতিটি জীবের মধ্যে কিছু না কিছু অলৌকিক শক্তি রয়েছে। একটা মানুষ কয়েক ঘণ্টার বেশী জলে থাকতে পারে না, কিন্তু একটা মাছ নিরন্তর সেখানে বাস করছে—সেটা কি অলৌকিক শক্তির প্রকাশ নয়?

ডঃ সিং ঃ আমার কাছে সেটা অলৌকিক শক্তি, কিন্তু মাছের কাছে নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তার কারণ হচ্ছে অলৌকিক শক্তি সমানভাবে বিতরণ করা হয়নি। কিন্তু সমস্ত অলৌকিক শক্তি ভগবানের মধ্যে রয়েছে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। তাঁর থেকে কিছুটা অলৌকিক শক্তি আমি পেয়েছি, তুমি পেয়েছ, পাখীরা পেয়েছে। এইভাবে সকলেই তাঁর থেকে কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি পেয়েছে, কিন্তু সমস্ত অলৌকিক শক্তির ভাণ্ডার হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং।

মূলতঃ আট রকমের অলৌকিক শক্তি রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে অণিমা (অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ার ক্ষমতা), মহিমা (পর্বতের থেকেও বড় হওয়ার ক্ষমতা), লঘিমা (পালকের থেকেও হাল্‌কা হওয়ার ক্ষমতা), প্রাপ্তি (যে কোনও জায়গা থেকে ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও কিছু পাওয়ার ক্ষমতা), ঈশিতা (ইচ্ছা অনুসারে কোন কিছুর সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করার ক্ষমতা), বশিতা (কাউকে বশ করার ক্ষমতা), প্রাকাম্য (ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু করার ক্ষমতা), এবং কামাবশায়িতা (অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা)। এই অলৌকিক শক্তিগুলিকে বলা হয় যোগসিদ্ধি। সূর্যের মধ্যে আর একরকম অলৌকিক শক্তি দেখা যায়। যেমন, সূর্য-রশ্মির থেকে অসংখ্য জিনিস অনির্বচনীয়ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। অলৌকিক

শক্তির অস্তিত্ব যদি বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার না করে, তাহলে তারা কোনকিছুরই ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তারা যা করছে সেটা কেবল কতকগুলি অনুমান মাত্র।

ডঃ সিং ঃ একজন ধূর্ত বৈজ্ঞানিক তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য কোন প্রমাণ না দিয়েই যা ইচ্ছা তাই বলে যেতে পারে। কিন্তু যিনি যথার্থ বৈজ্ঞানিক, তিনি অবশ্যই মূল কারণের চরম বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, যদি সে পরম উৎস খুঁজে না পায়, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অনুশীলন করছে না।

ডঃ সিং ঃ অলৌকিক সম্বন্ধে অবগত হওয়া মানে কি প্রতিদিন যে আমাদের মৃত্যু হচ্ছে তা জানা?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু সাধারণ মানুষ ভেবে দেখে না যে, প্রতিনিয়তই তার মৃত্যু হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা তার মূর্খতা। প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু সে মনে করছে, "আমি চিরকাল বেঁচে থাকব।" প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকেই আমাদের মৃত্যু হতে শুরু করে। এই সমস্যার বিশ্লেষণ করে আমরা বলছি, যেহেতু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই মৃত্যুকে রোধ করা। কিন্তু তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা সেই মৃত্যুকে কেবল ত্বরান্বিতই করছে না, তারা তাদের সেই ভুলগুলি সংশোধন করার ব্যাপারে সমস্ত সৎ-উপদেশগুলি গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক।

সপ্তম প্রাতঃভ্রমণ

৮ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং এবং অন্য কয়েকজন শিষ্য।

প্রতারক এবং প্রতারিত

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ভারশূন্যতা—প্রকৃতির এই সমস্ত ঘটনাগুলি অচিন্ত্য শক্তি, এবং যথার্থ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অচিন্ত্য শক্তিকে জানা। কোন বিশেষ সময়ে কতকগুলি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করাই যথার্থ বিজ্ঞান নয় এবং তার ফলে যে জ্ঞান লাভ হয়, সেটা যথার্থ জ্ঞান নয়। আমাদের জানতে হবে সবকিছুর শুরু কোথায়। আমরা যদি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রকৃতির উৎস হচ্ছে অচিন্ত্য শক্তি। যেমন ধর, আমাদের চিন্তা-শক্তি খাটিয়ে রং তুলি দিয়ে আমরা একটা ফুল আঁকতে পারি। কিন্তু আমরা কখনও বুঝে উঠতে পারি না কি ভাবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আপনা থেকেই গাছে ফুল ফুটছে এবং সেইগুলি ফলে পরিণত হচ্ছে। রং তুলি দিয়ে আঁকা ফুলটার বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ফুলের বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি না। জীবদের বৃদ্ধি যে কিভাবে হয়, তা বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারা কেবল কতকগুলি বড় বড় কথা সৃষ্টি করেছে—'মলিকুল', 'ক্রোমোজোম্', কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কোন বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না।

তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের মূল ভ্রান্তি হচ্ছে যে তারা আরোহ পন্থার মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছে। যেমন,

একজন বৈজ্ঞানিক যদি আরোহ পন্থার মাধ্যমে বিচার করতে চায় মানুষ মরণশীল কি না, তাহলে তাঁকে দেখতে হবে যে, প্রতিটি মানুষই মরছে কি না। বৈজ্ঞানিকেরা বলে, "প্রতিটি মানুষই যে মরণশীল, এ প্রস্তাবটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা এখনও সমস্ত মানুষকে দেখি নি, এমন কোন মানুষ থাকতেও পারে, যার মৃত্যু হয় না। তাহলে মানুষ মরণশীল সেটা আমরা কি ভাবে মেনে নেব?" একেই বলা হয় আরোহ পন্থা। আর অবরোহ পন্থা হচ্ছে—তোমার পিতা, তোমার শিক্ষক অথবা তোমার গুরু তোমাকে বললেন যে, মানুষ মাত্রই মরণশীল, এবং তুমি সেটা সরল বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিলে।

ডঃ সিং ঃ তাহলে জ্ঞান আহরণের দুটি পন্থা রয়েছে—আরোহ পন্থা এবং অবরোহ পন্থা?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। আরোহ পন্থার মাধ্যমে কখনই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না, কেননা তা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অপূর্ণ। তাই আমরা অবরোহ পন্থার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করি।

আরোহ পন্থার মাধ্যমে কখনই ভগবানকে জানা যায় না। তাই ভগবানের আর একটা নাম হচ্ছে অধোক্ষজ, যার অর্থ হচ্ছে, "ইন্দ্রিয়ের লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায় না।" বৈজ্ঞানিকেরা বলে, যেহেতু আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না বা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি না, তাই আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি ত অধোক্ষজ। তাই বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কেননা তাঁকে জানার যে প্রকৃত উপায় সেই উপায় তারা অবলম্বন করছে না। দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের অবশ্যই সদ্-গুরুর শরণাগত হতে হবে, বিনীতভাবে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতে হবে এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁর সেবা করতে হবে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া— "প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে গুরুদেবের কাছ থেকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয়।"

আমাদের গুরু মহারাজ একবার বলেছিলেন, "এই যুগটা হচ্ছে প্রতারক এবং প্রতারিতের যুগ।" দুর্ভাগ্যবশতঃ, যারা প্রতারিত তারাই প্রতারকদের গুণ-কীর্তন করছে, আর ছোটখাটো প্রতারকেরা বড় প্রতারকদের পূজা করছে। কতকগুলো গাধা এসে আমার গুণ-কীর্তন করে যদি বলে, "ওঃ, আপনি হচ্ছেন জগদ্‌গুরু",—তাদের সেই প্রশংসার কি মূল্য আছে? কিন্তু একজন ভদ্রলোক বা পণ্ডিত যদি প্রশংসা করেন, সেই প্রশংসার অনেক মূল্য আছে। সাধারণতঃ যারা গুণ-কীর্তন করছে, এবং যাদের গুণ-কীর্তন হচ্ছে, তারা উভয়েই অজ্ঞ। *বেদে* সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ* "ছোটখাটো জানোয়ারগুলি বড় জানোয়ারদের গুণ-কীর্তন করছে।"

করুণা

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আইন প্রতারণা করছে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রতারণা করছে এবং সরকার প্রতারণা করছে। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ নিচ্ছে, পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে। সরকার যদি ঘুষ নেয়, পুলিশ যদি ঘুষ নেয়, তাহলে সেই সমাজে শান্তি আসবে কোথা থেকে? রাজনৈতিক নেতারা জনসাধারণকে সুখ দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আর জনসাধারণও তাদের ভোট দিচ্ছে। কিন্তু সুখ তারা দেবে কোথা থেকে? এই সুখ হচ্ছে কুহেলিকা। সুখ তারা কখনই দিতে পারে না। এইভাবে সমাজ প্রতারকে ভরে যাচ্ছে। যেহেতু মানুষ এই মায়াসুখের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, তাই তারা বারবার এই ধরনের প্রতারকদের তাদের নেতারূপে নির্বাচন করছে।

একজন বৈষ্ণবই কেবল এই সমস্ত মূর্খ মানুষগুলির প্রতি কৃপা-পরায়ণ হতে পারেন। মহাবৈষ্ণব প্রহ্লাদ মহারাজ এক সময়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে ভগবান, আমার নিজের কোন সমস্যা নেই। আমার চেতনা সবসময়েই পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত আপনার অপ্রাকৃত লীলায় মগ্ন, আর তাই আমি সবকিছুই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু এই যে সমস্ত মূর্খ মানুষগুলি মায়া-সুখভোগের প্রচেষ্টায় মগ্ন হয়ে আছে, তাদের জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।"

বৈষ্ণবের সর্বক্ষণের চিন্তা হচ্ছে কিভাবে মানুষ যথার্থ আনন্দ লাভ করতে পারবে। তিনি জানেন, তারা যে সুখের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হচ্ছে, সে সুখ তারা কোনদিনও পাবে না। ৫০-৬০ বছর ধরে মানুষ অনুসন্ধান করে, কিন্তু তারপরে তাদের কার্য সম্পূর্ণ করার আগেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং তখন তারা বুঝতে পারে না তাদের মৃত্যুর পর তাদের কি হবে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের অবস্থা একটা পশুর মত, কেননা একটা পশুও জানে না তার মৃত্যুর পর তার কি হবে। তার জীবনের মূল্যও পশু জানে না, এবং সে জানে না কেন সে এখানে এসেছে। মায়ার প্রভাবে সে কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের চিন্তায় মগ্ন থেকে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটাই হচ্ছে তাদের জীবন। মূর্খ পশুগুলি এবং পশুসদৃশ মানুষগুলি সারা জীবন ধরে কেবল এই পাঁচটি কর্মই করে চলে— আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এবং অবশেষে মৃত্যু। তাই বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে ভগবান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া; তারা যে ভগবানের নিত্য সেবক, তা তাদের জানিয়ে দেওয়া এবং ভগবানের সেবা করে তাঁর প্রতি আমাদের শাশ্বত প্রেম উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করার শিক্ষা প্রদান করা।

খাঁচার বহিরে

ডঃ সিং ঃ কিন্তু যতক্ষণ জীব জড়া-প্রকৃতিতে রয়েছে, ততক্ষণ ত' তার জড় পদার্থের প্রয়োজন আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, জীব চিন্ময়; তাই তার জড় পদার্থের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু তার চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে গেছে, তাই সে মনে করছে যে তার সেগুলি প্রয়োজন। বদ্ধ জীবের অবস্থা হচ্ছে একটা নেশাখোরের মত। প্রকৃতপক্ষে মদ খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সে মনে করছে, "মদ খেতে না পেলে আমি মরে যাব।" একে বলা হয় মোহ। তোমরা কি মনে কর যে, একটা মাতাল যদি মদ খেতে না পায় তাহলে সে মরে যাবে?

ডঃ সিং ঃ না, কিন্তু একটা মানুষ যদি খেতে না পায়, তাহলে সে মরে যাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটাও সত্যি নয়। গতকাল রাত্রে আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কথা আলোচনা করছিলাম। তাঁর শেষ জীবনে তিনি আহার এবং নিদ্রা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছিলেন। ৩-৪ দিন অন্তর তিনি কেবল একটুখানি দুধের মাঠা খেতেন এবং প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা ধরে সেবা করতেন, বড় জোর দু-এক ঘণ্টার জন্য একটু বিশ্রাম করতেন। আর কোন কোন দিন তিনি একেবারেই ঘুমাতেন না। তাহলে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পার, "তিনি তাহলে বেঁচে থাকলেন কি করে?" তিনি একশ বছর বেঁচে ছিলেন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এগুলোর কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত, তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন যে দেহরূপ একটা খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও আত্মা চিন্ময় এবং জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসলে সেই দেহটার কোন প্রয়োজন

নেই। একটা পাখী যদি খাঁচায় আবদ্ধ থাকে, তাহলে কি বুঝতে হবে যে সেই খাঁচাটা আছে বলে সে বেঁচে আছে? না, বরং খাঁচাটা না থাকলেই ভাল। কারণ খাঁচার বন্ধন না থাকলে সে মুক্ত। ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ মনে করছে যে এই খাঁচাতে আবদ্ধ হয়ে আছে বলেই সে সুখী। সেটা অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে আমরা সর্বক্ষণ নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি, সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকছি। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা জড়-কলুষ থেকে মুক্ত হব—তখন এই দেহে থাকলেও আমাদের কোনরকম শোক বা ক্লেশ কিছুই থাকবে না—তখন আমরা অভয় হব; সবরকম ভয় থেকে মুক্ত হব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা না শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥

"ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যাঁর আত্মা প্রসন্ন হয়েছে, তিনি কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা করেন না বা কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সমস্ত জীবের প্রতি তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন।" এই অবস্থায় আমাদের স্বাভাবিক চিন্ময় অস্তিত্বে আমরা অধিষ্ঠিত হই। তখন আর ভয়, অনুশোচনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু জীব যে কিভাবে জড়ের থেকে মুক্ত হতে পারে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ চাইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যতক্ষণ তুমি বদ্ধ অবস্থায় থাক, ততক্ষণ তুমি জড়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আফ্রিকার মত একটা গরম দেশের মানুষ, সে গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই সে এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। তাই এখানে এলে অস্বস্তি অনুভব

করে। কিন্তু এখানে অনেক মানুষ রয়েছে, (সমুদ্রের তীরে ক্রীড়ারত কতকগুলি শিশুকে দেখিয়ে) এরা এই ঠাণ্ডায় কোনরকম অস্বস্তি বোধ করে না। সহ্য করার ক্ষমতাটা কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

তুমি যখন কোন অবস্থায় অভ্যস্ত থাক, তখন তুমি শীত, উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হও। কিন্তু তুমি যখন মুক্ত হও, তখন এই ধরনের ধারণাগুলি আর থাকে না। দিব্য জীবন মানে হচ্ছে এই দ্বন্দ্ব ভাব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেটাই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। বদ্ধ অবস্থা মানে হচ্ছে, জীব যদিও নিত্য, কিন্তু তার বদ্ধ ধারণাগুলির ফলে সে মনে করছে যে তার জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, রোগ হচ্ছে এবং সে জরাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু মুক্ত পুরুষ কখনও বৃদ্ধ হন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* কৃষ্ণের সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *অদ্বৈতম্‌ অচ্যুতম্‌ অনাদিম্‌ অনন্ত রূপম্‌ আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*—অর্থাৎ, তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ বা প্রথম পুরুষ, কিন্তু তা বলে তিনি বৃদ্ধ নন। তাঁর রূপ সব সময়েই একজন নবযৌবনসম্পন্ন পুরুষের মত, কেননা তিনি পূর্ণ চিন্ময়।

অষ্টম প্রাতঃভ্রমণ

১১ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল

লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং

এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

চেতনার বিবর্তন

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ রয়েছে দেখলাম যে, ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন জীব-শরীর সব একসঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটা কি ঠিক?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ তার মানে কি এই যে, ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে না গিয়েই কিছু জীব সরাসরিভাবে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। জীব এক দেহ থেকে আরেক দেহে ভ্রমণ করে। বিভিন্ন রকমের শরীর রয়েছে। জীব কেবল দেহান্তরিত হয়, ঠিক যেমন একজন মানুষ একটা বাড়ি পাল্টে আরেকটা বাড়িতে যায়। কোন বাড়ি খুব ভাল, কোন বাড়ি চলনসই, আর কোন বাড়ি অত্যন্ত খারাপ। যেমন ধর, কোন মানুষ একটা অতি খারাপ বাড়ি ছেড়ে একটা খুব ভাল বাড়িতে এসে বাস করতে শুরু করল। এখন, সে মানুষটা একই, কিন্তু তার ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা অনুসারে বা তার কর্ম অনুসারে সে এখন একটা ভাল বাড়িতে বাস করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃত বিবর্তনের অর্থ দৈহিক উন্নতি নয়, চেতনার উন্নতি। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ পারছি। তাহলে তার অর্থ কি এই যে, কেউ যদি নিকৃষ্ট স্তরের জীবনে অধঃপতিত হয়, তাহলে তাকে ধাপে ধাপে উন্নত স্তরে উঠে আসতে হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যেমন বেশী টাকা থাকলে তুমি আরও ভাল বাড়ীতে বাস করতে পার। বাড়িগুলি ঠিকই রয়েছে। এমন নয় যে, নিকৃষ্ট স্তরের বাড়িগুলি উন্নত স্তরের বাড়িতে পরিণত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে ডারউইনের ভ্রান্ত ধারণা। সে বলছে যে নিকৃষ্ট স্তরের বাড়িগুলি উৎকৃষ্ট বাড়িতে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, জীবনের উদ্ভব হয়েছে জড় পদার্থ থেকে। ওরা বলে যে, কোটি কোটি বছর আগে জীবন ছিল না, কেবল জড় পদার্থগুলি ছিল। সেই মতবাদ আমরা স্বীকার করি না। দুরকমের শক্তি রয়েছে—জীব-শক্তি এবং জড় শক্তি। জীব বা আত্মা হচ্ছে উৎকৃষ্ট শক্তি এবং জড় পদার্থ হচ্ছে নিকৃষ্ট শক্তির প্রকাশ।

ডঃ সিং ঃ সে দুটি কি একই সঙ্গে বিরাজ করছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু জীব-শক্তি বা আত্মা স্বাধীন আর জড় শক্তি পরাধীন। যেমন, আমার হাত অথবা পা না থাকলেও আমি বেঁচে থাকি। তাদের কেটে ফেলে দিলেও আমি বেঁচে থাকতে পারি। তাই আমি আমার হাত এবং পায়ের অধীনস্থ নই; কিন্তু আমার হাত এবং পা আমার অধীন, আমার এই শরীরকে সজীব করে রেখেছে যে চিন্ময় আত্মা, তার অধীন।

অনন্ত কামনা-বাসনার শরীর

ডঃ সিং ঃ কিন্তু জীব এবং জড় শক্তি কি একই সঙ্গে আসে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। তারা মোটেই 'আসে' না। তারা রয়েছে। এই 'আসার' ধারণাটা আমাদের মনগড়া, কেননা আমরা এই সীমিত জগতে

বাস করছি, যেখানে আমরা দেখছি যে, সবকিছুরই একটা শুরু আছে। তাই আমরা মনে করছি যে, তারা যেন 'আসছে'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা উভয়েই বর্তমান। যখন আমার জন্ম হয়, তখন আমি মনে করি যে, আমার জন্মের ফলে পৃথিবীর প্রকাশ হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী আগে থেকেই ছিল। আরেকটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে আগুন। যখন তুমি আগুন জ্বালাও, তাপ এবং আলোকের প্রকাশ কি তার পরে হয়? না। যে মুহূর্তে আগুন জ্বালানো হয়, তৎক্ষণাৎ তাপ এবং আলোকের প্রকাশ হয়। কিন্তু আমি যদি মনে করি, "আমি এখন আগুন জ্বালিয়েছি, এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাপ এবং আলোক দেখা দেবে", তাহলে সেটা কি মূর্খতা নয়?

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ, আগুন হচ্ছে তাপ এবং আলোকের উৎস।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, তাপ এবং আলোক একসঙ্গে আগুনের মধ্যে বিরাজ করছে। তেমনই, নিত্য বস্তু জীবের অনন্ত কামনা-বাসনা রয়েছে। আর বিভিন্ন ধরনের জীব শরীরগুলিও নিত্য কাল ধরে বিরাজ করছে জীবকে তার অসংখ্য কামনা-বাসনাগুলি চরিতার্থ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

ডঃ সিং ঃ জীব কি তার কামনা-বাসনা অনুসারে বিভিন্ন শরীরে বাস করছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যেমন সরকার কারাগার তৈরী করে, কেননা সরকার জানে যে, রাজ্যে কয়েদী থাকবেই। তাই কোন আসামীকে যখন বিচারের মাধ্যমে দণ্ড দেওয়া হয়, তখন তাকে কারাগারে পাঠান হয়। তার বিচারের আগেই কারাগারের অস্তিত্ব ছিল। তেমনই যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ তিনি সবকিছু জানেন, তাই তিনি জানেন যে, কিছু জীব তাঁর সেবা করতে না চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে। অধিকন্তু তিনি জানেন যে, প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় জগতে জীব নানারকমের কামনা-বাসনা করে; তাই তিনি সৃষ্টির আদিতেই বদ্ধ জীবদের জন্য কামনা-বাসনা অনুসারে বিভিন্ন শরীরে বাস করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতির তিনটি গুণ হচ্ছে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। তিনটি মৌলিক রঙের (লাল, হলুদ এবং নীল) মিশ্রণে যেমন অসংখ্য রঙের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনই জড় জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এই তিনটি গুণের দ্বারা। অসীম দক্ষতার সঙ্গে প্রকৃতির এই মহান আয়োজন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। *ভগবদ্‌গীতার* তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*—"প্রকৃতিতে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।" আর প্রকৃতির এই সমস্ত গুণগুলি প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জীব শরীরের মাধ্যমে, যা হচ্ছে গাছপালা, জলচর প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, মানুষ আদি ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন শরীর।

পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে প্রকাশিত করে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। জড় শরীরে অবস্থান করলেও তিনি জড় নন, যদিও তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জড় শরীরের আদি উৎস। তাপ এবং আলোক যেমন সূর্যের শক্তি, তাই সূর্য কখনও মনে করে না, "আজ কি ভীষণ গরম!" তেমনই পরমাত্মার কাছে চিৎ-শক্তি এবং জড় শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা তাঁরা উভয়েই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কখনও কখনও আমরা দেখি যে, মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, কিন্তু আমাদের অপূর্ণতার জন্যই এইরকম প্রতীত হয়। এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে মনে হয় কখনও সূর্য দেখা যাচ্ছে এবং কখনও তা মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে; কিন্তু সূর্য যদিও মেঘ সৃষ্টি করে তবুও সূর্য-লোকে যারা রয়েছে, তারা কেবল সূর্য-কিরণই সবসময় দেখতে পাবে। তেমনই জড় এবং চেতনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা আমাদের অভিজ্ঞতা—ভগবানের নয়। তিনি তথাকথিত জড় শরীর ধারণ করেই আসুন অথবা চিন্ময় শরীর ধারণ করেই আসুন, তিনি সর্বদাই চিন্ময়। তাঁর কাছে জড়-শক্তি এবং চিৎ-শক্তি উভয়েই সমান,

কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। তিনি জড় পদার্থকে চেতনে পরিবর্তিত করতে পারেন, আবার চেতন বস্তুকে জড়তে পরিণত করতে পারেন।

H_2O-এর মধ্যে অলৌকিক শক্তি

ডঃ সিং ঃ রসায়নবিদ এবং বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, কতকগুলি মৌলিক উপাদানের প্রভাবে আত্মা জড় শরীরে থাকতে সমর্থ হয়। তারা বলে যে, সেই উপাদানগুলি হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন—এবং এই সমস্ত উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু *বেদ* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, এ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে জীবনের প্রকাশ হচ্ছে, তাই নয় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যেমন, একটি গাছকে বর্ধিত হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই মাটিতে রয়েছে, কিন্তু প্রথমে তোমাকে সেই মাটিতে একটি বীজ বপন করতে হবে। তেমনই, শরীর সৃষ্টি করার সমস্ত উপাদানগুলি মাতৃগর্ভে রয়েছে, কিন্তু পিতাকে প্রথমে সেই গর্ভে বীজ বপন করতে হয়। একটি কুকুরের গর্ভে কুকুরের শরীর তৈরী হয়, আর একটি মানুষের গর্ভে মানুষের শরীর তৈরী হয়। কেন? কেননা কুকুরীর গর্ভে কুকুরের শরীর তৈরী করার সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে, আর মানবীর গর্ভে মানবের শরীর তৈরী করার সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে।

আমরা দেখি যে, আমাদের শরীরে কতকগুলি উপাদান কিছু পরিমাণে রয়েছে, ক্ষুদ্র অনুপাতে সেই উপাদানগুলি একটি পিঁপড়ের শরীরে রয়েছে, আবার অনেক বেশী পরিমাণে একটি হাতীর শরীরে রয়েছে। সুতরাং আমি যদি একটা পিঁপড়ের থেকে এত বেশী পরিমাণে এই সমস্ত রাসায়নিক উপাদানগুলি তৈরী করতে পারি এবং একটি হাতী

যদি আমার থেকেও এত অধিক পরিমাণে এই রাসায়নিক উপাদানগুলি তৈরী করতে পারে, তাহলে একবার চিন্তা করে দেখ, কি পরিমাণ রাসায়নিক উপাদান ভগবান তৈরী করতে পারেন! এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিকদের বিবেচনা করা উচিত কি ভাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ের ফলে জল সৃষ্টি হচ্ছে। তা না হলে এই সমুদ্র তৈরী করতে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তার উৎস তারা কোনদিনও নিরূপণ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা পারি। এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ভগবানের 'বিরাট রূপে'র মধ্যেই রয়েছে। এই সাধারণ তত্ত্বটা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না কেন? হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ের ফলে সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। এই তথ্য আমরা উভয়েই স্বীকার করি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ কথা শুনে আশ্চর্য হয় যে, এই বিশাল পরিমাণে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের উৎস হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বা ভগবানের অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক শক্তি।

জীবনের সংজ্ঞা

ডঃ সিং ঃ জীব এবং জড়ের সংজ্ঞা নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজেও মতবিরোধ হতে আমি দেখেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে, যা বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম, তা সজীব। তাই তারা দাবী করে যে, তারা জীবন সৃষ্টি করেছে। কেননা তারা গবেষণাগারে কতকগুলি বড় ডি. এন. এ. অণু বা মলিক্যুল তৈরী করেছে, যেগুলি তাদের অবিকল প্রতিরূপ তৈরী করতে পারে; অর্থাৎ তারা নিজে নিজেই অণু সৃষ্টির শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (Chain of molecules) তৈরী করতে পারে। তাই কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বলছে যে, এই ডি. এন. এ-গুলি হচ্ছে সজীব, আর কেউ কেউ বলছে যে—না, সেই ধারণাটা ভ্রান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাদের এই মতবিরোধ থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

ডঃ সিং ঃ জীবনের সংজ্ঞা দিয়ে আমরা কি বলতে পারি যে, 'যা চেতন' তা হচ্ছে 'সজীব', আর 'যা অচেতন' তা হচ্ছে 'নির্জীব'?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৭) বলেছেন, *অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্*— "সমস্ত শরীর জুড়ে যা রয়েছে তা অবিনাশী।" যে কেউই বুঝতে পারে যে, একটা জীবন্ত প্রাণীর সমস্ত শরীর জুড়ে যা রয়েছে, তা হচ্ছে চেতনা। আমাদের চেতনা অনুসারে মৃত্যুর পর আমরা বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত হই। তোমার চেতনা যদি একটা কুকুরের মত হয়, তাহলে তুমি একটা কুকুরের শরীর পাবে, আর তোমার চেতনা যদি স্বর্গের দেবতাদের মত হয়, তাহলে তুমি একটা দেব-শরীর পাবে। কৃষ্ণ সকলকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে শরীর প্রাপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে, যারা ভূত-প্রেত পূজা করে, তারা ভূত-প্রেত হয়ে জন্মাবে, যারা পিতৃ পূজা করে, তারা পিতৃ সান্নিধ্যে যাবে, আর যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমার কাছে ফিরে আসবে।" (ভগবদ্গীতা ৯/২৫)

ডারউইনের ভ্রান্তি

ডঃ সিং ঃ কোন মানুষ যদি মুক্তিলাভ না করে থাকে, তাহলে কি তাকে মানব জীবন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আবার ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করতে হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, কেবল নিম্ন স্তরের জীবনেই জীবকে প্রকৃতির নিয়মে স্তরে স্তরে বিবর্তিত হতে হয়। মনুষ্য শরীর পাওয়ার ফলে সে উন্নত চেতনা প্রাপ্ত হয়—তার ফলে সে বিচার করতে পারে, বিবেচনা করতে পারে। তাই যদি তার চেতনা উন্নত হয়, তাহলে তাকে আর কুকুর-বিড়ালের শরীর প্রাপ্ত হতে হবে না; তখন সে আরেকটা মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হবে।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"যোগভ্রষ্ট পুরুষ বহু বহু বছর ধরে পুণ্যলোক সমূহে আনন্দ উপভোগ করার পর শুচি এবং শ্রী সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।" (ভঃ গীঃ ৬/৪১) 'যোগভ্রষ্ট' কথাটির অর্থ হচ্ছে, যে যোগী পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করেন নি। এখানে বিবর্তনের কোন প্রশ্নই নেই; তিনি তখন আবার একটি মানব শরীর প্রাপ্ত হন। তিনি কুকুরের অথবা বিড়ালের শরীর প্রাপ্ত হন না। এটা ঠিক বাড়ি বদল করার মত, যা আমরা আগে আলোচনা করছিলাম। তোমার যদি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুমি একটা ভাল বাড়ি পেতে পার। তোমাকে নিকৃষ্ট স্তরের বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে উৎকৃষ্ট বাড়িতে আসতে হবে না।

ডঃ সিং ঃ আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণরূপে ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ডারউইন একটা মূর্খ। ওর আবার মতবাদ কি? ওর মতবাদকে আমরা আদৌ গ্রহণ করি না। ওর মতবাদকে যত অগ্রাহ্য করা যায় ততই ভাল, আর ততই আমরা পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হব।

ডঃ সিং ঃ অনেক বৈজ্ঞানিকও ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু ডারউইনের অনুগামীরা বলে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। তারা বলে যে, সৃষ্টির আদিতে পশু এবং মানুষের মত উন্নত জীব-শরীর ছিল না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ডারউইন এবং তার অনুগামীরা হচ্ছে এক-একটা মূর্খ। প্রথম থেকেই যদি উন্নত স্তরের জীবন না থাকত, তাহলে তারা এল কোথা থেকে? আর তাছাড়া নিম্নস্তরের জীবনগুলি এখনও তাহলে কেন রয়েছে? যেমন এখন আমরা দেখি যে, প্রখর বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষ আর গর্দভের মত একটা নির্বোধ প্রাণী উভয়েই রয়েছে। এই দু'রকমের জীব যুগপৎ বর্তমান কেন? বিবর্তনের ফলে উন্নত শরীর প্রাপ্ত হয়ে গর্দভগুলি লুপ্ত হয়ে গেল না কেন? আজ পর্যন্ত কি আমরা কোন বানরের গর্ভে মানব শিশুর জন্ম হতে দেখেছি? ডারউইন যে বলছে অমুক সালে মানব জীবনের শুরু হয়েছিল, তা একটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার বাসনা অনুসারে মৃত্যুর পর যে কোনও শরীরে দেহান্তরিত হতে পার। আমি কখনও আমেরিকায় যাই, কখনও অস্ট্রেলিয়ায়, আবার কখনও আফ্রিকায়। দেশগুলি যথাস্থানেই রয়েছে। আমি কেবল সেই দেশগুলিতে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। এমন নয় যে, আমি আমেরিকায় এসেছি বলে আমি আমেরিকা সৃষ্টি করেছি অথবা আমি আমেরিকা হয়ে গেছি। আরও অনেক দেশ রয়েছে সেগুলি আমি এখনও দেখিনি। তার মানে কি সেই দেশগুলির কোন অস্তিত্ব নেই? যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ডারউইনের মতবাদকে প্রশ্রয় দেয়, তারা হচ্ছে এক-একটা মহামূর্খ। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সবরকমের প্রজাতি যুগপৎ বর্তমান, এবং তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে পার। তুমি ইচ্ছা করলে ভগবানের ধামেও যেতে পার। এই সমস্ত তথ্য *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ঘোষণা করে গেছেন।

নবম প্রাতঃভ্রমণ

১৩ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের শ্যেভিয়ট হিল্‌স্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং,
করন্ধর দাস এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

মানুষ থেকে কুকুরে বিবর্তন

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল প্রতারণার নীতিতে বিশ্বাসী। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —"আমি সবকিছুর মূল উৎস।" কৃষ্ণ হচ্ছেন জীবন; তিনি **কোন** জড় পাথর নন।

ডঃ সিং ঃ সুতরাং, জড় পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে জীবন থেকে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। জীবন থেকে জড় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং জীবনের উপর ভিত্তি করেই তা বেড়ে ওঠে। আমার দেহ আমার উপর, অর্থাৎ আত্মার উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যে ওভারকোটটা আমি পরেছি, সেটি আমার দেহের মাপ অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি যে, "আমি হচ্ছি এই ওভারকোট", তাহলে সেটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে।

জনৈক শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, খনিজ-পদার্থ বিশারদ বা আকরিকবিদেরা প্রমাণ করেছে যে, পলি পড়ার ফলে পাহাড়-পর্বতাদি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে। চিন্ময় আত্মার উপস্থিতির ফলেই কি এই বৃদ্ধি হচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* পর্বতকে ভগবানের অস্থি রূপে এবং ঘাসকে তাঁর শরীরের লোম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, এই অর্থে ভগবানের শরীর হচ্ছে সবচাইতে বৃহৎ।

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, আত্মার পশুর দেহে রূপান্তর এবং মানুষের দেহে রূপান্তরের মধ্যে পার্থক্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ পশুদের ক্ষেত্রে রূপান্তরের ধারাটা কেবল একদিকেই নির্দিষ্ট থাকে, এবং তা হচ্ছে উর্ধ্বমুখী। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা উভয়দিকেই হতে পারে। মানুষ উচ্চতর জীবনও লাভ করতে পারে, আবার নিম্নতর জীবনও লাভ করতে পারে। জীবকে তার বাসনা অনুসারে দেহ প্রদান করা হয়ে থাকে। পশুদের বাসনা সবসময় এক রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের বাসনা বহু রকমের—একাধারে পশুর বাসনা ও মানুষের বাসনা। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জীব ক্রমে ক্রমে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয় এবং অবশেষে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য দেহ লাভ করে যদি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করা হয়, তাহলে আবার বিড়াল কিংবা কুকুরের দেহ গ্রহণ করতে হতে পারে।

নির্বাণ

ডঃ সিং ঃ মনুষ্য জীবনের উর্ধ্বে এবং নিম্নেও যে বিবর্তনের ধারা রয়েছে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের কোন ধারণাই নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেইজন্যই তো আমি ওদের মূর্খ বলি। ওদের কোন জ্ঞানই নেই, তবুও ওরা নিজেদের বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করে। প্রকৃত বিজ্ঞান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) দেওয়া হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ বলেছেন—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।* এর অর্থ হল এই যে, এই জীবনে একজন যে রকম ভজনা করবে, পরবর্তী জীবনে সে ঠিক সেই রকমই দেহ লাভ করবে। কিন্তু সে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে, তাহলে সে দৈহিক রূপান্তরের এই যে পর্যায়-ক্রম, তার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*— "যখন কেউ আমার সেই পরম ধাম প্রাপ্ত হন, তিনি আর ফিরে আসেন না (জন্ম-মৃত্যুর এই ক্ষয়শীল জগতে)।" (ভঃ গীঃ ৮/২১) চিন্ময় জগতে গতি লাভ করাই *(সংসিদ্ধিং পরমম্)* হল মনুষ্য জীবনের পরম সার্থকতা, সেখানেই জীবনের পূর্ণতা। *ভগবদ্গীতা* পাঠ কর; সবকিছু সেখানে রয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এই সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই; এমনকি তারা জড় দেহের বাইরে জীবের যে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে, তা বিশ্বাসই করে না।

ডঃ সিং ঃ তারা আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলে না; তারা কেবল স্থূল দেহের সম্বন্ধেই বলে থাকে।

জনৈক শিষ্য ঃ তাদের মতবাদ অনেকটা বৌদ্ধদের মত। বৌদ্ধরা বলে যে, দেহটা হচ্ছে ঠিক একটা বাড়ির মত। কাঠ ও পাথরের সংযোজনে যেমন একটা বাড়ি তৈরী করা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই এই দেহটাও রসায়নের সংযোজনে তৈরী হয়েছে। আর দেহটা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তার অবস্থা একটা ভেঙ্গে পড়া বাড়ির মত হয়। একটা বাড়ি ভেঙ্গে গেলে যেমন ভাঙ্গা কাঠ-পাথর ছাড়া তার আর অন্য কোন অস্তিত্ব থাকে না, ঠিক তেমনই মৃত্যু হলে দেহটিও কেবল রসায়নে পরিণত হয় এবং সেটি আর দেহ থাকে না বা সেখানে কোন জীবন থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটাকে নির্বাণ বলা হয়। আর তখন ঐ সব উপাদান দিয়ে আরেকটা বাড়ি বা দেহ তৈরী করা যায়। সেটাই হচ্ছে বৌদ্ধদের মতবাদ। আত্মার সম্বন্ধে বৌদ্ধদের কোন জ্ঞানই নেই।

অদৃষ্ট ও কর্ম

জনৈক শিষ্য ঃ অনেক বৈজ্ঞানিক আছে, যারা বলে যে একই দেহে একাধিক আত্মা বিরাজ করে। এই প্রসঙ্গে তারা কেঁচোর দৃষ্টান্ত দিয়ে

থাকে। যদি একটা কেঁচোকে দুভাগে কাটা হয়, তাহলে তার দুটো অংশই জীবন্ত থাকে। তাদের মন্তব্য যে, দুটি আত্মা একত্রে একটি কেঁচোর দেহে বিরাজ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। একটি নতুন আত্মা এসে ওই কেঁচোর দেহের অপর অংশটিতে প্রবেশ করে।

ডঃ সিং ঃ প্রতিটি আত্মারই কি জাগতিক কিংবা চিন্ময় দেহ ধারণ করা আবশ্যক?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রতিটি আত্মারই চিন্ময় দেহ রয়েছে, যা জড় দেহের আবরণে আবৃত। আমার জড় দেহ আমার উপর—আমার চিন্ময় দেহের উপর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু এই জড় দেহটি আমার স্বাভাবিক দেহ নয়। আমি যে বিভিন্ন দেহগুলি প্রাপ্ত হচ্ছি, আমার প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। বাস্তবে, আমার প্রকৃত অবস্থায় আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি, ততক্ষণ আমাকে জড়ের দাসত্ব করতে হবে এবং জড় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আমাকে অনেক জড় দেহ গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে আমি একটা দেহ গ্রহণ করি, আবার সেটা ত্যাগ করি। অন্য বাসনা করার ফলে আমাকে অন্য আর একটা দেহ গ্রহণ করতে হয়। জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে এটি হয়ে চলেছে। মানুষ মনে করে যে, তারা তাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু তারা সবসময় প্রকৃতির কঠোর নিয়মের অধীন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে ॥

"প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিমূঢ় আত্মা নিজেকে প্রতিটি কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে।" (ভঃ গীঃ ৩/২৭) এই বিমূঢ়তা আসছে, কারণ সে চিন্তা করছে যে, আমি হচ্ছি এই দেহ।"

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

এই শ্লোকে 'যন্ত্র' শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন জন্মে আমরা যে বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হই, সেগুলি ঠিক জড় প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রের মত। কখনও আমরা উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে উচ্চতর দেহ লাভ করি, আবার কখনও নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে নিম্নগতি লাভ করি। কিন্তু কেউ যদি গুরু-কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তি-লতা বীজ লাভ করে, অর্থাৎ ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যথাযথভাবে বর্ধিত করার চেষ্টা করে, তাহলে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারে। তখন তার জীবন সার্থক হয়। আর তা না হলে তাকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে বেড়াতে হবে—কখনও উচ্চে, আবার কখনও নিম্নে; কখনও ঘাস হয়ে জন্মাতে হবে, আবার কখনও সিংহ হয়ে জন্মাতে হবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ দেহান্তর চলতেই থাকবে।

অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে জাহির করছে

জনৈক শিষ্য ঃ সুতরাং আমাদের ভোগ করার বাসনার ফলেই আমরা এই জড় দেহ লাভ করি এবং কৃষ্ণকে লাভ করবার বাসনার ফলে আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হই?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের ইতর বা নিম্নতর প্রবৃত্তির সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়। ইন্দ্রিয়ের লালসা চরিতার্থ করার যে

বাসনা, তার সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছি। যদিও আমরা আবার কৃষ্ণসেবাও করতে চাই। এই সংগ্রাম কি অনবরত চলতেই থাকে?

জনৈক শিষ্য ঃ দেহ সবসময় মনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তার অর্থ হল এই যে, তুমি জড় প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

ডঃ সিং ঃ সেই অবস্থায়ও কি আমরা কৃষ্ণকে সেবা করার বাসনা করি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। একটি চোর যদিও জানে যে সে যদি চুরি করে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্ধ করে রাখা হবে—এমনকি সে হয়ত এরকম অনেককেই গ্রেপ্তার হতে দেখেছে—তবুও সে চুরি করে চলে। যদিও সে জানে যে, সে রাজ্যের শাসনাধীন, তবুও সে তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। এটাকেই বলা হয় 'তমসা' বা অজ্ঞানতা। সেইজন্য জ্ঞানই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভিক সোপান। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান প্রদান করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, "তুমি এই দেহ নও।" এটাই জ্ঞানের প্রারম্ভ। কিন্তু এই জ্ঞান প্রদান করার মত বিশ্ববিদ্যালয় আজ কোথায়? এখন কোথায় এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে এই জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়?

ডঃ সিং ঃ সে রকম একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এইতো বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার হাল; এর মধ্যে জ্ঞান বলে কিছু নেই। তারা অজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে জাহির করছে, আর মানুষকে তাই-ই শিক্ষা দিচ্ছে।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যদি জানত যে তারা তাদের দেহ নয়, তাহলে তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে যেত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, আমরাও সেটাই চাই।

জনৈক শিষ্য ঃ কিন্তু তারা তাদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে চায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে সেটা তাদের আরেক রকমের বোকামি। তুমি যদি বোকা হও এবং নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করার চেষ্টা করো, তাহলে সেটা আরেক ধরনের বোকামি হবে। তখন তুমি আর উন্নতি করতে পারবে না। আর তুমি যদি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাক এবং নিজেকে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে জাহির করার চেষ্টা কর, তাহলে তুমি একটা মহাপ্রতারক রূপে বিবেচিত হবে। তুমি নিজেকে প্রতারণা করছ এবং অন্যকেও প্রতারণা করছ। মানুষ জড়-সভ্যতার উন্নতির জন্য এত বেশী পাগল হয়ে উঠেছে যে তারা ঠিক কুকুর-বিড়ালের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিটি দেশের সরকার একটা করে 'ইমিগ্রেশন' বিভাগ খুলে রেখেছে এবং যখনই তুমি কোন দেশে প্রবেশ করতে যাবে, এই কুকুরগুলো গিয়ে তোমায় বাধা দেবে, "হুপ, হুপ, হুপ! কেন তুমি এসেছ? তোমার কি প্রয়োজন?" এটা ঠিক একটা দ্বার-রক্ষী কুকুরের মত আচরণ। একটা পিস্তলের জন্য একজন সত্যিকারের ভদ্রলোককে খানাতল্লাসী করা হয়। মানুষের উপর মানুষের কোন বিশ্বাস নেই। আর এখন হাজার হাজার শিক্ষিত চোর-বদমাইশ সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং, এই উন্নতির কি মূল্য আছে? আমরা কি বলতে পারি যে, এই শিক্ষার অর্থ হচ্ছে উন্নতি? এটা কি কোন সভ্যতা?

যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

জনৈক শিষ্য ঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, কম্যুনিস্টদের নাস্তিকতা ভিয়েতনাম যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ। এটা আস্তিক এবং নাস্তিকবাদীদের মধ্যে একটা বিতর্কমূলক ঝগড়া। ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণগুলি দেখাতে গিয়ে অন্ততঃ এই একটি যুক্তি দেখান হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমরাও নাস্তিকদের হত্যা করতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই হত্যাটা হবে প্রচারের মাধ্যমে। আমি যদি তোমার 'তমসা' বা

অজ্ঞানতাকে নাশ করি, তাহলে তাকেও "হত্যা করা" বলা যেতে পারে। হত্যা করার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেককেই অস্ত্র ধারণ করতে হবে।

ডঃ সিং ঃ একটা নতুন ধরনের যুদ্ধ?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চিরদিনই হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র দেহগত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন, তা পাশবিক জীবন। পশুরা চিন্ময় ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে জানে না। তারা আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না, এবং যারা শুধুমাত্র দেহকেন্দ্রিক হয়ে জীবন যাপন করে, তারা পশুদের থেকে কোন অংশে উন্নত নয়। পশুরা যখন "কথা বলে", বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তখন তা শুনে হাসে। এই ধরনের "কথা" নিরর্থক। পশুরা কখনও জ্ঞানের কথা বলে না।

জনৈক শিষ্য ঃ পশুরা অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট উপায়ে জীবন ধারণ করে থাকে। তারা অনর্থক হত্যা করে না, এবং তারা কেবল প্রয়োজন হলেই খায়। কিন্তু মানুষেরা অযথা পশু হত্যা করে খায়। সুতরাং এক অর্থে মানুষেরা পশুদের থেকেও অধম।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেইজন্য আমাদের পশুদের থেকে বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। কৃষ্ণভাবনা মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা-কল্পনার ভিত্তিতে গঠিত কোন মিথ্যা ধর্ম নয়। মানুষের দুঃখ-কষ্টের ভার লাঘব করার জন্য এটি বিজ্ঞান সম্মত একটি যথার্থ ধর্ম।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য লোকেরা বলে থাকে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই দৈবক্রমে ঘটছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং, এই বিষয়বস্তুর উপর লিখিত তাদের বইগুলোও দৈবাৎ?

করন্ধর ঃ তারা বলে যে, তাদের বইগুলো দৈবক্রমেই লেখা হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে তাদের আর কৃতিত্ব কি রইল? দৈবক্রমে ত' যে কোন জিনিসই লেখা হতে পারে।

ডঃ সিং ঃ ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডঃ মোনোডের মতে দৈবক্রমে সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছিল—অর্থাৎ, দৈবক্রমে নির্দিষ্ট কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান একত্রে মিলিত হয়ে কতকগুলি যৌগিক পরমাণুর সৃষ্টি করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু রাসায়নিক উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়েছিল কি ভাবে?

ডঃ সিং ঃ তাঁর ধারণা দৈবক্রমেই তাদের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তখন রাসায়নিক উপাদানের পরমাণুগুলি আবার স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যদি দৈবক্রমেই সবকিছু ঘটছিল, তাহলে ত' আর প্রয়োজনের প্রশ্নই ছিল না। দৈবক্রম এবং প্রয়োজন—এই দুটি বিপরীতমুখী কথা একই মুখে কেমন করে বলা সম্ভব? এটা সম্পূর্ণ মূর্খতা। সবকিছুই যদি দৈবক্রমে ঘটে, তাহলে কেন লোকে তাদের সন্তানদের শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠায়? দৈবের উপর নির্ভর করে তাদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয় না কেন? ধরা যাক, আমি একটি নিয়ম ভঙ্গ করলাম। এখন আমি যদি বলি, "এটা দৈবক্রমে হয়ে গিয়েছে", তাহলে আমাকে কি ক্ষমা করা হবে?

ডঃ সিং ঃ সুতরাং, অজ্ঞানতার ফলেই কি অপরাধ হচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সেটাই কারণ—আমার অজ্ঞানতাই এর কারণ।

জনৈক শিষ্য ঃ যদি বলা হয় যে, বেহালার মত একটা সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল নিতান্ত দৈবক্রমে, তাহলে সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। এটি খুবই দুঃখের বিষয় যে, এমন একজন মূর্খও বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃতি পেতে পারে। সে মূর্খের মত অবান্তর সব কথা বলছে, আর তাকেই বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

দশম প্রাতঃভ্রমণ

১৪ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের শ্যেভিয়ট হিল্‌স্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং
এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈজ্ঞানিকদের ভুলটা হচ্ছে যে, তারা দুটি শক্তি—পরা এবং অপরা বা চেতন এবং জড় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা বলে যে, সবকিছুই জড় এবং জড়ের থেকেই সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে। তাদের এই মতবাদের গলদটা হচ্ছে যে, চিৎশক্তি থেকে শুরু না করে তারা জড় পদার্থ থেকে শুরু করছে। জড়ের উদ্ভব হয় চেতন থেকে, তাই একদিক দিয়ে সবকিছুই চিন্ময়। চিৎ-শক্তি হচ্ছে সবকিছুর উৎস এবং তার অস্তিত্ব জড়-শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু চিৎ-শক্তি ছাড়া জড়-শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। যদি বলা হয় আলোক থেকে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়, তাহলে কোন ভুল হয় না; কিন্তু আলোকের প্রকাশ অন্ধকার থেকে হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, চেতনা আসছে জড় পদার্থ থেকে। প্রকৃতপক্ষে, চেতনার অস্তিত্ব সবসময়েই রয়েছে, কিন্তু তা যখন অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে বা কলুষিত হয়ে পড়ে, তখন তা অচেতন হয়ে পড়ে।

সুতরাং 'জড়' মানে হচ্ছে কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া, এবং 'চিন্ময়' মানে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। তোমরা বুঝতে পারছ? বুঝবার চেষ্টা কর—অন্ধকার কি ভাবে আলোক থেকে আসে। যখন

আলোক থাকে না, তখন অন্ধকার হয়ে যায়। সূর্যে মেঘ নেই; তা সূর্যের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু সূর্যের শক্তির প্রভাবে সাময়িকভাবে অনেক কিছুর সৃষ্টি হয়, যেমন কুয়াশা, মেঘ অথবা অন্ধকার। এই সৃষ্টিগুলি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সূর্যের অস্তিত্ব সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তেমনই জড় জগৎ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু চিন্ময় জগৎ হচ্ছে নিত্য। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে এই অনিত্য জড়া প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিত্য, শাশ্বত, চিন্ময় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই অনিত্য প্রকৃতিতে কেউই থাকতে চায় না; এই মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ কারোরই ভাল লাগে না।

ডঃ সিং ঃ এই আচ্ছন্ন চেতনা কি চিন্ময় শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ এবং জড়ের প্রকাশও হয়েছে চেতন বা পরা-প্রকৃতি থেকে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিই হচ্ছি জড় এবং চেতন সমস্ত কিছুর উৎস। আমার থেকেই সবকিছুর প্রকাশ হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১০/৮) ভাল এবং খারাপ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে, 'ভাল এবং মন্দ' একটি আপেক্ষিক জড় ধারণা। কৃষ্ণের সৃষ্টি সবসময়ই মঙ্গলময়; ভগবান সর্ব অবস্থাতেই মঙ্গলময়। তুমি যাকে খারাপ বলে মনে করছ, ভগবানের কাছে তা-ও ভাল। তাই আমরা কৃষ্ণকে বুঝতে পারি না। তাঁর কোন কার্যকলাপ আমাদের কাছে খারাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে ভাল অথবা খারাপ বলে কিছু নেই। যেমন, কৃষ্ণ ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। কোন মানুষ তাঁর সমালোচনা করে বলতে পারে, "ওঃ, তিনি স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন।" কিন্তু তারা আসল বিষয়টি বুঝতে পারে না। কৃষ্ণের শক্তি এতই মহান যে, তিনি ষোল হাজার পতিরূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন।

"সবই এক" কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন

ডঃ সিং ঃ আপনি বললেন যে, কুয়াশারূপী এই জড় জগৎটি অনিত্য। তাহলে যা ক্ষণস্থায়ী, তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা কেন চেষ্টা করব?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি কেন কাপড় দিয়ে তোমার শরীর আচ্ছাদন কর? তুমি ত' নগ্ন হয়েও চলাফেরা করতে পার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ত' আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাহলে তুমি কাপড় পরছ কেন?

ডঃ সিং ঃ কেননা এখন প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঠাণ্ডা অনুভব করছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সে যাই হোক না কেন, তুমি কেন কাপড় দিয়ে তোমার শরীরটা ঢাকার প্রয়াস করছ?

ডঃ সিং ঃ অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার জন্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তা না হলে তুমি কষ্ট পাবে। পোশাক নিয়ে মাথা না ঘামাবার তত্ত্বটা হচ্ছে মায়াবাদ-দর্শন; যেন "সবকিছু আপনা থেকেই আসবে, সুতরাং তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। সবকিছুই এক।" এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মায়াবাদ দর্শন হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন এক এবং সবকিছু—সমস্ত জীব ভগবানের সমান।

বৈজ্ঞানিকেরা যদি জীবন থেকে তাদের গবেষণা শুরু করত, তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মতবিরোধ থাকত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা বলে যে, সবকিছুরই প্রকাশ হচ্ছে অন্ধকার থেকে—মৃত জড় পদার্থ থেকে। আমরা সেটারই প্রতিবাদ করি। আমরা বলি, "সবকিছুরই উৎস হচ্ছে জীবন", আর তারা বলে, "না, সবকিছুর উৎস হচ্ছে জড় পদার্থ—অন্ধকার।" তারা যে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে তার কারণটাও খুব সরল। কেউ যদি অন্ধকার থেকে আলোকে যায়, তখন

সে মনে করে যে, অন্ধকার থেকেই আলোকের উদ্ভব হয়েছে। মনে কর তুমি সারা জীবন অন্ধকারের মধ্যে ছিলে, তারপর হঠাৎ তুমি আলোকে এলে। তুমি তখন মনে করবে, "ওঃ, অন্ধকার থেকেই আলোকের উদ্ভব হয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে, আলোক না থাকাটাই হচ্ছে অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আলোকের উদ্ভব হয় না।

ডঃ সিং ঃ তাহলে কি অন্ধকার আলোকের উপর নির্ভরশীল?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। অর্থাৎ, আলোকের মধ্যে অন্ধকার নেই। আলোক যখন থাকে না—তখনই আমাদের অন্ধকার অনুভব হয়। তেমনই, আমাদের চিন্ময় চেতনা বা কৃষ্ণভাবনা যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখনই আমরা জড় জগৎকে অনুভব করি।

সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি, এবং দিনের শেষে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কোন না কোন ভাবে জীবন যখন ব্যাহত হয়, সেই অবস্থাটি হচ্ছে নিদ্রা। রাত্রে আমরা নিদ্রিত হই, এবং সকালে যখন আমরা জেগে উঠি তখন আমরা মনে করি না যে, নিদ্রিত অবস্থা থেকে আমাদের জীবনের উদ্ভব হয়েছে। আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম, তখনও আমি জীবিত ছিলাম, এবং জেগে ওঠার পরও আমি জীবিত আছি। এই তত্ত্বটি স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। একটি শিশুর জন্ম হয় তার মাতৃগর্ভ থেকে। সে মনে করে, যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে তার জীবনের শুরু হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সে নিত্য। অচেতন অবস্থায় মাতৃগর্ভে সে তার জড়দেহটি তৈরী করেছিল, এবং যখন সেই দেহটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথেষ্টভাবে বর্ধিত হল, তখন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় চেতন হল।

ডঃ সিং ঃ মৃত্যুর সময় সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সে কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

"হে পার্থ! প্রাণীরা কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রহ্মার দিবস আগমনে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা বিলীন হয়ে যায়; আবার ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হলে উৎপন্ন হয়।"

আমরা এই দেহ নই

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই ফুলটা দেখছ? এটি পুনরায় চেতন হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই এটি শুকিয়ে যাবে এবং তখন তার মৃত্যু হবে। এটাই হচ্ছে জড় জীবন। কিন্তু চিন্ময় জীবন মানে হচ্ছে কেবল বিকশিতই হওয়া—কখনও বিলীন না হওয়া। সেটিই হচ্ছে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য। পূর্ববর্তী জীবনের চেতনা অনুসারে আমি এই দেহটি প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমার এই জীবনের চেতনা অনুসারে আমি আমার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হব। সে কথাও *ভগবদ্‌গীতায়* (৮/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে —

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় মানুষ যে বিষয় চিন্তা করতে করতে কলেবর ত্যাগ করে, সর্বদা সেই বিষয়ের ভাবনায় তন্ময় হয়ে থাকার ফলে সে সেই রকম শরীর প্রাপ্ত হয়।"

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, যদি আমরা সবসময় আমাদের পূর্ববর্তী জীবনের চেতনা অনুসারে পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হই, তাহলে কেন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী জীবনের কথা স্মরণ করতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি গত বছর অথবা গতকাল যা করেছ, তা সবই কি তোমার মনে আছে?

ডঃ সিং ঃ না, আমার মনে নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটাই হচ্ছে তোমার প্রকৃতি—ভুলে যাওয়া।

ডঃ সিং ঃ কিছু কিছু...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কেউ বেশী ভুলে যায়, কেউ কম ভুলে যায়। কিন্তু সকলেই ভুলে যায়।

ডঃ সিং ঃ সেটাই কি জড়-জগতের ধর্ম?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটা অনেকটা চুরি করার মত। কেউ পকেটমার, আর কেউ বড় ডাকাত; কিন্তু তারা উভয়েই চোর।

ডঃ সিং ঃ আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন কি আমরা সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে নীত হই?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রকৃতি তোমাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অহঙ্কারে বিমূঢ় জীব মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের কর্তা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।" আমরা আমাদের যথার্থ পরিচয় ভুলে যাই, কেননা আমরা জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ।

পারমার্থিক জীবনের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে, এই শরীরটি আমাদের স্বরূপ নয়; আমাদের স্বরূপে আমরা হচ্ছি নিত্য, শাশ্বত, চিন্ময় আত্মা। একটা সময় ছিল যখন তুমি একটি শিশু ছিলে। আর এখন তুমি একজন পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছ। তোমার শিশু শরীরটি কোথায় গেল? সেটির আর কোন অস্তিত্ব এখন নেই। কিন্তু তুমি

এখনও আছ, কেননা তুমি হচ্ছ নিত্য; পরিবর্তনশীল শরীরটির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তোমার কোন পরিবর্তন হয় নি। এটিই হচ্ছে নিত্যত্বের প্রমাণ। গতকাল তুমি যা করেছ, তার কিছু কিছু হয়ত তুমি স্মরণ করতে পার, কিন্তু অন্য বিষয়গুলি তুমি ভুলে গেছ। তোমার গতকালের শরীর এবং আজকের শরীর এক নয়। সেটা তুমি স্বীকার কর? তুমি বলতে পার না যে, আজকের দিনটি হচ্ছে ১৯৭৩ সালের ১৩ই মে। তুমি বলতে পার না যে, আজকের দিনটি হচ্ছে গতকাল। ১৩ তারিখ ছিল গতকাল। দিনের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু গতকালের কথা তোমার মনে আছে; এবং সেই মনে রাখাটাই হচ্ছে তোমার নিত্যত্বের প্রমাণ। শরীরের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার কথা তোমার মনে আছে; তাই তুমি হচ্ছ নিত্য, যদিও এই শরীরটি হচ্ছে অনিত্য। এই প্রমাণটি অত্যন্ত সরল। একটি শিশুও তা বুঝতে পারে। এটা বোঝা কি খুব কঠিন?

দেহের পরিবর্তন

ডঃ সিং ঃ মানুষ আরও বেশী প্রমাণ চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এর বেশী আর কি প্রমাণের প্রয়োজন? আত্মার নিত্যত্ব একটি অতি সরল সত্য। আমি একটি নিত্য আত্মা। আমার শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আমি পরিবর্তিত হচ্ছি না। যেমন, এখন আমি একজন বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে আমি মনে করি, "ওঃ, একসময় লাফালাফি করে আমি কত খেলা করেছি, কিন্তু এখন আমি লাফালাফি করতে পারি না।" কেননা, আমার শরীরের পরিবর্তন হয়েছে। আমি লাফালাফি করতে চাই, কিন্তু তা করতে পারি না। লাফালাফি করবার ঐ প্রবণতাটা নিত্য, কিন্তু যেহেতু আমার শরীরটি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি আর তা করতে পারি না।

ডঃ সিং ঃ বিরুদ্ধ পক্ষ বলবে যে, তাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে চেতনার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র একটি শরীরেই থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা মূর্খতা। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"যেমন দেহধারী আত্মার বর্তমান দেহে ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্তি হয়, তেমনই মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আরেকটি দেহ প্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরা এই পরিবর্তনের ফলে মোহগ্রস্ত হন না।" এই শরীরটি যেমন নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে (যা আমি আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি), মৃত্যুর সময়ও তেমন একটি পরিবর্তন হয়।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই শেষ পরিবর্তনটি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাদের দৃষ্টি এত আচ্ছন্ন যে তারা অনেক কিছুই দেখতে পায় না। তারা মূর্খ হতে পারে, কিন্তু তা বলে *ভগবদ্গীতা* ভ্রান্ত হয়ে যাবে না। বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা স্বীকার করে না কেন? প্রথমেই তাদের স্বীকার করতে হবে যে, তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত ও ত্রুটিযুক্ত। তাদের দর্শন-শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌টি বিজ্ঞান এবং কোন্‌টি বিজ্ঞান নয়, তা নির্ধারিত হবে না। কুকুর প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে প্রকৃতির কোন নিয়ম নেই?

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ, সেকথা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করছে; কিন্তু তারা বলছে যে, পূর্ণতা প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। সেটা পূর্ণতা প্রাপ্তির উপায় নয়। সীমিত চিন্তাধারার মাধ্যমে কেউ কখনও পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের চিন্তাধারা অবশ্যই সীমিত, কেননা আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সীমিত।

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, আরেকটি বিষয়ের উত্থাপন করা যেতে পারে। আত্মার পক্ষে কি তিনটি, চারটি অথবা পাঁচটি শরীর ধারণ করার পর মারা যাওয়া সম্ভব নয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি কোটি কোটি শরীর ধারণ করছ। আমি আগেই বলেছি যে, তোমার গতকালের শরীর তোমার আজকের শরীর নয়। সুতরাং তুমি যদি একশ' বছর বেঁচে থাক, তাহলে তোমার কত শরীরের পরিবর্তন হয়েছে? সেটা শুধু একটু হিসাব কর।

ডঃ সিং ঃ তেরটি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তেরটি কেন?

ডঃ সিং ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয় যে, প্রতি সাত বছরে দেহের কোষগুলির পরিবর্তন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, প্রতি সাত বছরে নয়—প্রতি সেকেণ্ডে। প্রতি সেকেণ্ডে রক্ত-কণিকার পরিবর্তন হচ্ছে—তাই নয় কি?

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, আত্মার নিত্যত্ব কি শক্তি-সংরক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ শক্তি-সংরক্ষণের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা শক্তি সবসময়েই রয়েছে।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, শক্তির অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, শক্তির সৃষ্টি নেই, অর্থাৎ তা নিত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, সেটা আমরা স্বীকার করি। কৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য; অতএব তাঁর সমস্ত শক্তিও নিত্য।

ডঃ সিং ঃ সেই কারণেই কি জীবও নিত্য?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সূর্য যদি নিত্য হয়, তাহলে তার শক্তি তাপ এবং আলোক—এরাও নিত্য।

ডঃ সিং ঃ তাহলে কি এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আত্মার সৃষ্টি নেই অথবা ধ্বংস নেই?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, জীবন হল নিত্য। তাকে সৃষ্টি করা যায় না। শুধু কেবল তা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। আমি নিত্য, কিন্তু গত রাত্রে নিদ্রার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম; তাই আমি গতকাল এবং আজ-এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি। এটিই হচ্ছে জড় জগতের অবস্থা।

সবকিছুই চিন্ময়

ডঃ সিং ঃ জড়-চেতনা বলতে কি কৃষ্ণ-চেতনার অভাবকেই বোঝায়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু যখন কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়, তখন জড় প্রকৃতি কোথায় যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি যদি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে থাক, তাহলে তুমি দেখবে যে, কিছুই জড় নয়। তুমি যখন কৃষ্ণকে একটি ফুল নিবেদন কর, তা জড় নয়। জড় হলে কৃষ্ণ তা গ্রহণ করতেন না। তবে তার অর্থ এই নয় যে, ফুলটি যখন গাছে ছিল, তখন তা জড় ছিল এবং যখন তা কৃষ্ণকে নিবেদন করা হল তখন তা চিন্ময় হয়ে গেল। না। ফুলটি 'জড়' কেবল যখন তুমি মনে কর যে, তোমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সেটি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু যখন তুমি দেখ যে, তা কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য, তখনই তুমি তাকে যথার্থ ভাবে দর্শন কর—চিন্ময় ভাবে।

ডঃ সিং ঃ তাহলে সমগ্র জগৎটি আসলে চিন্ময়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তাই আমরা সবকিছুই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতে চাই; সেটি হচ্ছে চিন্ময় জগৎ।

ডঃ সিং ঃ সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কি আমরা কৃষ্ণের সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে পারি? যেমন, আমরা কি মনে করতে পারি যে, "এই গাছটি খুব সুন্দর, কেননা তা কৃষ্ণের সম্পত্তি"?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

ডঃ সিং ঃ কেউ যদি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করে মনে করে যে, এটি কেবল কাঠ অথবা পাথর, তাহলে তার অর্থ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ জড় হবে কি করে? পাথরও ত' কৃষ্ণের শক্তি। ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু একজন বিদ্যুৎ-শক্তি বিশারদই কেবল জানেন কি ভাবে তা ব্যবহার করতে হয়। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই রয়েছেন—এমনকি পাথরের মধ্যেও রয়েছেন; কিন্তু তাঁর ভক্তরাই কেবল জানেন কি ভাবে পাথরের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। ভক্তরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া পাথরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভক্ত যখন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, তিনি তখন বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ এখানে রয়েছেন।" তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তির যথার্থ অভিন্নতা দর্শন করেন।

যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ

ডঃ সিং ঃ এটা কি সত্যি যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত পাথর থেকে খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং একটি সাধারণ পাথর উভয়ের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ ঠিক একই ভাবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তাতে অসুবিধাটা কোথায়? *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি না চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আংশিক প্রকাশিত রূপ নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। কিন্তু তাঁর শ্রীবিগ্রহে তাঁর পূর্ণ প্রকাশিত রূপ তাঁরই নির্দেশিত আকারে প্রকট হয়েছে। এটিই হচ্ছে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব' দর্শন—ভগবান এবং তাঁর শক্তির যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ। যেমন, তোমার ঘরে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে। তার অর্থ এই নয় যে, সূর্য স্বয়ং তোমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সূর্য এবং তাঁর বহুধা শক্তি, যেমন তাপ এবং আলোক গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগত ভাবে ভিন্ন।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু তবুও আপনি বলছেন যে, একটি পাথরের মধ্যেও কৃষ্ণকে দর্শন করা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, করা যাবে না কেন? আমরা পাথরটিকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে দর্শন করি।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু আমরা কি সেই পাথরটির মধ্যেই তাঁকে পূজা করতে পারি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ পাথরটিতে বিরাজমান তাঁর শক্তির মাধ্যমে আমরা তাঁকে পূজা করতে পারি। কিন্তু সেই পাথরটিকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে আমরা পূজা করতে পারি না। এই বেঞ্চিটিকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে আমরা পূজা করতে পারি না। কিন্তু সবকিছুই পূজা করতে পারি, কেননা আমরা

সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে দর্শন করি। এই গাছটি পূজনীয়, কেননা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শক্তি উভয়েই পূজনীয়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে আমরা যে ভাবে পূজা করি, এই গাছটিকেও আমরা ঠিক সেইভাবে পূজা করব।

আমার শৈশবে আমার মা-বাবা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কখনও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অপচয় না করতে। তাঁরা আমাকে শিখিয়েছিলেন যে, মেঝেতে যদি একদানা চালও পড়ে থাকে, তাহলে সেটি তুলে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে নিতে, যাতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অপচয় না হয়। সবকিছুই কি ভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে দর্শন করতে হয়, সে শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই আমরা কোনকিছুর অপচয় বা অপব্যবহার বরদাস্ত করতে পারি না। আমরা আমাদের শিষ্যদের সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করতে এবং সবকিছুই যে কৃষ্ণ, তা উপলব্ধি করতে শিক্ষা দিচ্ছি। এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩০) বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

"যে আমাকে সর্বত্র দর্শন করে এবং আমার মধ্যেই সবকিছুকে দর্শন করে, তার কাছে আমি কখনও হারিয়ে যাই না বা সেও আমার কাছে হারিয়ে যায় না।"

একাদশ প্রাতঃভ্রমণ

১৫ই মে, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের শ্যেভিয়ট হিলস্ পার্কে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং
এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার পন্থা

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারছে যে, আত্মাকে দেখতে পাওয়া কঠিন। তারা বলে যে, আত্মার অস্তিত্ব সন্দেহজনক।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা কেমন করে আত্মাকে দেখবে? তা এত ক্ষুদ্র যে তাকে দেখা যায় না। তাকে দেখবার মত শক্তি কার আছে?

ডঃ সিং ঃ কিন্তু তবুও কোন না কোন ভাবে তারা তাকে উপলব্ধি করতে চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি যদি কোন উগ্র বিষের এক কণার একশ' ভাগের এক ভাগ কারও শরীরে ইনজেকশন কর, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। সেই বিষটি কেউ দেখতে পায় না! অথবা কি ভাবে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারে না, কিন্তু তবুও তা ক্রিয়া করছে। তেমনই, বৈজ্ঞানিকেরা আত্মার কার্যকলাপের মাধ্যমে কেন আত্মাকে দর্শন করে না? এখানে তার কার্যকলাপের মাধ্যমে তাকে দর্শন করতে হবে। *বেদ গ্রন্থে* বলা হচ্ছে যে, এই অতি ক্ষুদ্র আত্মার অস্তিত্বের প্রভাবেই সমস্ত শরীর এত সুন্দরভাবে কাজ করছে। কেউ যদি আমাকে চিম্‌টি কাটে, আমি তৎক্ষণাৎ তা অনুভব করতে পারি, কেননা সমস্ত শরীর জুড়ে আমার চেতনা রয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে আত্মা শরীরটি ছেড়ে

চলে যায়, বাস্তবিক পক্ষে আমার মৃত্যুর সময় যা হয়, তখন তুমি শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পার, কিন্তু তখন আর আমি তার কোন প্রতিবাদ করব না। এই সহজ বিষয়টি বুঝতে অসুবিধাটা কোথায়? এইভাবে কি আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না?

ডঃ সিং ঃ এইভাবে আমরা হয়ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব কি ভাবে অনুভব করা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রথমে আত্মাকে জানা যাক্। আত্মা হচ্ছে ভগবানের একটি নমুনা। তুমি যদি নমুনাটিকে বুঝতে পার, তাহলে তুমি পূর্ণ বস্তুটিকেও বুঝতে পারবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ঃ সাহায্য করছে না ক্ষতি করছে?

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ "চেষ্টা করছে।" "তৈরীও করল বলে!" ঐ সমস্ত অজুহাতগুলি আমরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি; ওসব আমরা স্বীকার করি না। একটা ভিখারী যদি বলে, "আমি কোটিপতি হওয়ার চেষ্টা করছি", তখন আমরা বলব, "যখন তুমি কোটিপতি হবে, তখন কথা বোল। এখন তুমি একজন ভিখারী; সেটাই তোমার পরিচয়।" বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, তারা চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি?" তুমি কি তখন বলবে, "আমি চেষ্টা করছি...?" তুমি এখন কি, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। "আমরা চেষ্টা করছি", সেটা যথাযথ উত্তর নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের এইসব বিবৃতির কোন ভিত্তি নেই!

ডঃ সিং ঃ যদিও এখনও পর্যন্ত তারা জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি, তবুও তারা বলে যে, শীঘ্রই তারা তা করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সে কথা যে কোন মূর্খও বলতে পারে। তুমি যদি বল, "ভবিষ্যতে আমি অস্বাভাবিক কিছু একটা করব", তাহলে সে কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, অতীতে তারা কত কিছু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা অনেক কিছু করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অতীতে মানুষ মারা যেত এবং এখনও মানুষ মারা যাচ্ছে। তাহলে বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে কি করেছে?

ডঃ সিং ঃ সাহায্য করেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈজ্ঞানিকেরা তাদের আয়ুক্ষয় করতে সাহায্য করেছে! আগে মানুষ একশ' বছর বাঁচত; এখন তারা বড় জোর ষাট কি সত্তর বছর বাঁচে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন আণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে; এখন তারা কোটি কোটি মানুষকে নিমেষের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে। সুতরাং তারা কেবল মরতে সাহায্য করেছে, তারা বেঁচে থাকতে সাহায্য করে নি। তবুও তারা ঘোষণা করছে যে, তারা জীবন সৃষ্টি করবে।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু তারা এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে এবং...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না; তারা জন্ম, ব্যাধি এবং জরাকেও রোধ করতে পারে না। সুতরাং তারা কি করেছে? পূর্বেও মানুষ জরাগ্রস্ত হত, এখনও মানুষ জরাগ্রস্ত হচ্ছে। পূর্বে মানুষ রোগাক্রান্ত হত, এখনও মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে। এখন অনেক ওষুধ সৃষ্টি হয়েছে—এবং রোগও বেড়েছে। সুতরাং তাদের কৃতিত্ব কোথায়? পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনে বৈজ্ঞানিকেরা কোনরকম সাহায্য করে নি। যে সমস্ত মূর্খ বৈজ্ঞানিক বলে যে, জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, তাদের আমরা চ্যালেঞ্জ করি। আসল সত্য হচ্ছে যে, জীবনের উদ্ভব হয়েছে জীবন থেকে।

প্রগতির মোহ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কতদিন আর বৈজ্ঞানিকেরা মানুষকে প্রতারণা করবে? এক শ' বছর, দুশ' বছর? তারা চিরকাল এইরকম প্রতারণা করতে পারবে না।

ডঃ সিং ঃ অনাদিকাল ধরে প্রতারণা চলছে, তাই তারা হয়ত মনে করে যে, তারা চিরকাল প্রতারণা করে যেতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অনাদিকাল ধরে নয়। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল গত দু' তিন শ' বছর ধরে মানুষকে প্রতারণা করছে, তার পূর্বে নয়।

ডঃ সিং ঃ তাই নাকি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, প্রায় গত দুশ' বছর ধরে তারা প্রচার করছে যে, "জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়"—তার পূর্বে নয়, এবং সেই প্রতারণার সমাপ্তি হবে আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই।

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ, এখন একটি তথাকথিত anti-intellectual আন্দোলন চলছে। মানুষ বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রগতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আর সেই বিজ্ঞানটি কি? তা বিজ্ঞান নয়! তা অজ্ঞান, বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানকে চালান হচ্ছে, এবং ধর্মের নামে অধর্মকে চালান হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতারণা বেশী দিন ধরে চলতে পারে না, কেননা কিছু মানুষ যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে তা বুঝতে পারছে।

ডঃ সিং ঃ আমেরিকার সবচাইতে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজউইকে' খ্রীষ্ট ধর্মের অবনতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এই প্রবন্ধে একটা কার্টুনে দেখানো হয়েছিল যে, শয়তান ভূমিকম্প ঘটাচ্ছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আমেরিকায় একটা মস্ত বড় ভূমিকম্প হয় এবং তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। সেই কার্টুনে এই সমস্ত ঘটনাগুলির কারণ হিসাবে শয়তানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,

এবং তার পাশেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী বলে নিজেকে প্রচারকারী রিচার্ড নিক্সনের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে—তিনি সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে বোমাবর্ষণ করছেন। সেই কার্টুনে শয়তান রিচার্ড নিক্সনকে বলছে, "খৃষ্টানদের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই কঠিন।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, মানুষ ওইভাবে সমালোচনা করবে। মানুষের প্রগতি হচ্ছে। কতদিন আর তারা তথাকথিত বিজ্ঞান এবং তথাকথিত ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হবে? মিঃ নিক্সন যদি তাঁর দেশবাসীকে ভালবাসেন, তাহলে তিনি তাঁর দেশের গরুগুলিকে ভালবাসেন না কেন? তারাও ত' সেই একই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদেরও বেঁচে থাকার সমান অধিকার আছে। তাদের কেন হত্যা করা হচ্ছে? Thou shalt not kill—"তুমি কাউকে হত্যা করো না"—কিন্তু বাইবেলের এই বাণী অগ্রাহ্য করে পশুদের হত্যা করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে গলদ। কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণী এবং গাভী—উভয়কেই আলিঙ্গন করছেন। এটাই হচ্ছে পূর্ণতা। এমনকি কৃষ্ণ পাখীদের সঙ্গেও কথা বলেন। একদিন যমুনার তীরে তিনি একটি পাখীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, কেননা তিনি পাখীদের ভাষাতেও কথা বলতে পারেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন—"ওঃ, কৃষ্ণ একটা পাখীর সঙ্গে কথা বলছে!"

ডঃ সিং ঃ আপনি কি বলতে চান যে, তিনি সত্যি সত্যিই একটি পাখীর সঙ্গে কথা বলছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। *বেদে* বর্ণিত কৃষ্ণের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তিনি যে কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি সমস্ত জীবের পিতা, এবং পিতা তাঁর সন্তানের ভাষা বুঝতে পারেন।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে, যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তাদের যথার্থ জ্ঞান থাকতে পারে না, এমনকি তারা যথার্থভাবে আনন্দও উপভোগ করতে পারে না। তারা কেবল দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু

প্রগতির মোহ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কতদিন আর বৈজ্ঞানিকেরা মানুষকে প্রতারণা করবে? এক শ' বছর, দুশ' বছর? তারা চিরকাল এইরকম প্রতারণা করতে পারবে না।

ডঃ সিং ঃ অনাদিকাল ধরে প্রতারণা চলছে, তাই তারা হয়ত মনে করে যে, তারা চিরকাল প্রতারণা করে যেতে পারবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অনাদিকাল ধরে নয়। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল গত দু' তিন শ' বছর ধরে মানুষকে প্রতারণা করছে, তার পূর্বে নয়।

ডঃ সিং ঃ তাই নাকি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, প্রায় গত দুশ' বছর ধরে তারা প্রচার করছে যে, "জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়"—তার পূর্বে নয়, এবং সেই প্রতারণার সমাপ্তি হবে আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই।

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ, এখন একটি তথাকথিত anti-intellectual আন্দোলন চলছে। মানুষ বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রগতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আর সেই বিজ্ঞানটি কি? তা বিজ্ঞান নয়! তা অজ্ঞান, বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানকে চালান হচ্ছে, এবং ধর্মের নামে অধর্মকে চালান হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতারণা বেশী দিন ধরে চলতে পারে না, কেননা কিছু মানুষ যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে তা বুঝতে পারছে।

ডঃ সিং ঃ আমেরিকার সবচাইতে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজউইকে' খ্রীষ্ট ধর্মের অবনতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এই প্রবন্ধে একটা কার্টুনে দেখানো হয়েছিল যে, শয়তান ভূমিকম্প ঘটাচ্ছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আমেরিকায় একটা মস্ত বড় ভুমিকম্প হয় এবং তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। সেই কার্টুনে এই সমস্ত ঘটনাগুলির কারণ হিসাবে শয়তানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,

এবং তার পাশেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী বলে নিজেকে প্রচারকারী রিচার্ড নিক্সনের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে—তিনি সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে বোমাবর্ষণ করছেন। সেই কার্টুনে শয়তান রিচার্ড নিক্সনকে বলছে, "খৃষ্টানদের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই কঠিন।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, মানুষ ওইভাবে সমালোচনা করবে। মানুষের প্রগতি হচ্ছে। কতদিন আর তারা তথাকথিত বিজ্ঞান এবং তথাকথিত ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হবে? মিঃ নিক্সন যদি তাঁর দেশবাসীকে ভালবাসেন, তাহলে তিনি তাঁর দেশের গরুগুলিকে ভালবাসেন না কেন? তারাও ত' সেই একই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদেরও বেঁচে থাকার সমান অধিকার আছে। তাদের কেন হত্যা করা হচ্ছে? **Thou shalt not kill**—"তুমি কাউকে হত্যা করো না"—কিন্তু বাইবেলের এই বাণী অগ্রাহ্য করে পশুদের হত্যা করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে গলদ। কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণী এবং গাভী—উভয়কেই আলিঙ্গন করছেন। এটাই হচ্ছে পূর্ণতা। এমনকি কৃষ্ণ পাখীদের সঙ্গেও কথা বলেন। একদিন যমুনার তীরে তিনি একটি পাখীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, কেননা তিনি পাখীদের ভাষাতেও কথা বলতে পারেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন—"ওঃ, কৃষ্ণ একটা পাখীর সঙ্গে কথা বলছে!"

ডঃ সিং ঃ আপনি কি বলতে চান যে, তিনি সত্যি সত্যিই একটি পাখীর সঙ্গে কথা বলছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। বেদে বর্ণিত কৃষ্ণের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তিনি যে কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি সমস্ত জীবের পিতা, এবং পিতা তাঁর সন্তানের ভাষা বুঝতে পারেন।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে, যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তাদের যথার্থ জ্ঞান থাকতে পারে না, এমনকি তারা যথার্থভাবে আনন্দও উপভোগ করতে পারে না। তারা কেবল দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু

তারা মনে করে যে, সেই দুঃখ ভোগ করাটাই হচ্ছে আনন্দ। এটাই হচ্ছে মায়া। আমেরিকায় মানুষেরা দিনরাত গাধার মত খাটছে, এবং তারা মনে করছে, 'আমি খুব আনন্দ উপভোগ করছি।' এটা সম্পূর্ণ মায়া। বদ্ধ জীব কখনও আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; সে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই ভোগ করে; কিন্তু সে মনে করে যে, সে আনন্দ উপভোগ করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বদ্ধ জীবকে উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উট কাঁটা গাছ খেতে খুব ভালবাসে। সেই কাঁটাগুলি খেতে খেতে তার জিভ কেটে যায়, তার জিভ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে সেগুলি কাঁটার সঙ্গে মিশে যায় এবং তখন সে মনে করে, 'এ কাঁটাগুলি কি সুস্বাদু!" একেই বলা হয় মায়া। মায়া মানে হচ্ছে, 'যা নয়।' 'মা' মানে হচ্ছে 'না' এবং 'য়া' মানে হচ্ছে 'এটি'। সুতরাং মায়া কথাটির অর্থ হচ্ছে 'এটি নয়'। সেটাই হচ্ছে মায়ার বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিকেরা মায়াচ্ছন্ন, কেননা তারা মনে করছে যে, তাদের সেই তথাকথিত প্রগতির মাধ্যমে তারা সুখী হবে। কিন্তু এই জগৎ, এই জগতের সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে, কেননা তা হচ্ছে মায়া; আমরা তাকে যা বলে মনে করছি, এটা আসলে তা নয়। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে, জড়বাদীরা মনে করছে যে তারা জয়ী হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পরাজিতই হচ্ছে।

দ্বাদশ প্রাতঃভ্রমণ

১৭ই মে, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং, করন্ধর দাস অধিকারী, কৃষ্ণকান্তি দাস অধিকারী এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

যৌগিক অস্ত্র

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই কুয়াশা দূর করার কোন শক্তি বৈজ্ঞানিকদের নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল বাক্যবিন্যাস করে বলে যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে তার উদ্ভব হয়েছে। (তিনি হেসে ওঠেন।) কিন্তু সেটা দূর করার শক্তি তাদের নেই।

ডঃ সিং ঃ কুয়াশা কি ভাবে সৃষ্টি হয়, তার বিশ্লেষণ তারা করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা হয়ত তারা পারে, এবং সেটা হয়ত আমিও পারি, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। তুমি যদি সত্যিই জান কি ভাবে তা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে সেটার প্রতিকার করার ক্ষমতাও তোমার থাকা উচিত।

ডঃ সিং ঃ আমরা জানি কি ভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে কি ভাবে তার প্রতিকার করতে হয়, সেটাও খুঁজে বার করো। পুরাকালে বৈদিক যুগে যুদ্ধে আণবিক ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করা হত এবং তা প্রতিহত করার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ এমন অস্ত্র ব্যবহার করত, যার ফলে ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি প্রতিহত হত। কিন্তু সে ধরনের বিজ্ঞান আজ কোথায়?

ডঃ সিং ঃ কুয়াশা হচ্ছে অনেকটা দুধের মত। দুধ দেখতে মনে হয় সাদা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় কতকগুলি সংঘবদ্ধভাবে ভাসমান প্রোটিন অণুর প্রভাবে (Colloidal suspension of protein molecules)। তেমনই কুয়াশা হচ্ছে ভাসমান ঘনীভূত জলকণা রাশি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং তুমি যদি আগুন সৃষ্টি করতে পার, তাহলে তৎক্ষণাৎ কুয়াশা দূর হয়ে যাবে; আগুনের দ্বারা জলকে দূর করা যায়। কিন্তু তুমি সেটা করতে পার না। তুমি যদি একটা বোমা বিস্ফোরণ কর, তাহলে তার ফলে তাপের সৃষ্টি হবে এবং তখন সমস্ত কুয়াশা দূর হয়ে যাবে।

করন্ধর ঃ তার ফলে সমস্ত শহরটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সকলেই জানে যে, আগুন জলকে বাষ্পীভূত করে দেয়। কিন্তু তুমি অসংখ্য মানুষকে হত্যা না করে এবং প্রভূত সম্পত্তি নষ্ট না করে কুয়াশা দূর করতে পার না। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবে যখনই সূর্যের উদয় হয়, তখনই কুয়াশা দূর হয়ে যায়। সূর্যের শক্তি তোমার থেকে অনেক বেশী। তাই তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে।

ভগবানের লক্ষণ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অচিন্ত্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলে ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান এত সস্তা নন যে, তথাকথিত যে কোনও যোগী ভগবান হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের মেকী ভগবানগুলি হচ্ছে নির্বোধ মূর্খদের জন্য। যারা বুদ্ধিমান, তারা পরীক্ষা করে দেখবে যে, তার অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে কি না। আমরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি, কেননা তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন করেছেন। একটি শিশুরূপে কৃষ্ণ একটি বিরাট পর্বত তুলে ধরেছিলেন। রামচন্দ্ররূপে

তিনি পাথর দিয়ে সমুদ্রে থামহীন ভাসমান সেতু তৈরী করেছিলেন। সুতরাং এই ধরনের অচিন্ত্য কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবানের ভগবত্তা উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে এত সস্তাভাবে নেওয়া উচিত নয়। আজকাল কতকগুলি পাষণ্ড এসে প্রচার করছে, "আমি হচ্ছি ভগবানের অবতার", আর অন্য কতকগুলি পাষণ্ড তাকে ভগবান বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। কখনও কখনও লোকেরা বলে যে, তাঁদের এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা কতকগুলি গল্পকথা বা কাল্পনিক উপাখ্যান মাত্র। কিন্তু সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছিলেন বাল্মীকি, ব্যাসদেব আদি মহান সমস্ত আচার্যেরা, যাঁরা হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি। এই মহর্ষিরা কেন কতকগুলি গল্পকথা লিখে তাঁদের সময়ের অপচয় করবেন? তাঁরা কখনও বলেননি যে, সেগুলি হচ্ছে কাল্পনিক উপাখ্যান। তাঁরা বাস্তব ঘটনা বলে সেগুলির বর্ণনা করেছেন। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ব্যাসদেব বৃন্দাবনের বনে এক দাবাগ্নির কথা বর্ণনা করেন। কৃষ্ণের সমস্ত গোপসখারা তাতে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর কৃষ্ণ তখন সেই দাবাগ্নি গিলে ফেলেন। এটা হচ্ছে একটা অচিন্ত্য শক্তি। এখানেই ভগবানের ভগবত্তা। আমরা হচ্ছি ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ, তাই আমরাও অচিন্ত্য যোগ-শক্তি লাভ করতে পারি—কিন্তু তা কেবল অতি স্বল্পমাত্রায়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন কৃষ্ণ

কৃষ্ণকান্তি ঃ মানুষের মস্তিষ্কের জটিলতা দেখে ডাক্তারেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক শরীরটিকে পরিচালনা করছে না, পরিচালনা করছে আত্মা। একটা কম্পিউটার কি নিজে

নিজেই কার্যকরী হতে পারে? না, একটা মানুষ তাকে চালায়। সে বোতাম টেপে, তার ফলে কম্পিউটারটি কার্যকরী হয়। তা না হলে সেই মেশিনের কি মূল্য আছে? তুমি হাজার হাজার বছর ধরে মেশিনটা রেখে দিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা মানুষ এসে সেই বোতামগুলি টিপছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কাজ করবে না। সুতরাং, আসলে কাজটা কে করছে, মেশিন না মানুষ? তেমনই মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটা মেশিনের মত, এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে তা কাজ করছে।

বৈজ্ঞানিকদের উচিত ভগবানকে এবং ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে মেনে নেওয়া। তা যদি তারা না করে, তাহলে সেটা তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক হবে। পারমার্থিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। সেদিন তুমি একজন রসায়নবিদকে নিয়ে এসেছিলে, এবং আমি তাকে বলেছিলাম, "আপনারা হচ্ছেন মহামূর্খ।" কিন্তু তিনি রেগে যান নি। তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমি তার সব কটি যুক্তি খণ্ডন করেছিলাম। সে কথা হয়ত তোমার মনে আছে।

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, কৃষ্ণ হয়ত তার গবেষণা করার সবকটি স্তর তার কাছে উন্মুক্ত করেন নি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সে কৃষ্ণ-বিরোধী, সুতরাং কৃষ্ণ কেন তাকে সুযোগ-সুবিধা দেবেন? তুমি যদি কৃষ্ণ-বিরোধী হও এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে নিজে নিজে কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি অবশ্যই অকৃতকার্য হবে। আমরা যে কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখি। কি ভাবে? কৃষ্ণের ভরসায়। আমি জানি যখন আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের পরাস্ত করবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি কৃষ্ণ আমাকে দেবেন। তা না হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আমাদের থেকে অনেক বেশী উন্নত। তাদের

তুলনায় আমরা কিছুই নয়। কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে জানি এবং কৃষ্ণ সবকিছু জানেন। তাই আমরা যে-কোনও বৈজ্ঞানিককে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। ঠিক যেমন একটি শিশু যখন তার বাবার হাত ধরে থাকে, তখন সে কোন বয়স্ক মানুষকে চ্যালেঞ্জ করতে ভয় পায় না। সে কেবল তার বাবার হাত ধরে থাকে, এবং তার বাবা তাকে রক্ষা করেন।

ডঃ সিং ঃ যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করে না, তাদের মানব জন্ম কি ব্যর্থ হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা জানবার চেষ্টা করে না, কতকগুলি পশুর মত তাদের মৃত্যু হয়—ঠিক কুকুর-বিড়ালের মত। তারা জন্মায়, খায়, ঘুমায়, সন্তান উৎপাদন করে এবং অবশেষে মরে যায়। সেটি হচ্ছে তাদের জীবনের পরিণতি। এই সমস্ত মূর্খগুলি মনে করে, 'আমি হচ্ছি আমার এই দেহটি।' আত্মা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* আমাদের আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন, কিন্তু এই মহান গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই নেই।

বৈদিক শাস্ত্রে মানব সমাজের জন্য যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আজকের মানুষ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন, *বেদ* গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গোময় হচ্ছে পবিত্র। কিন্তু এখন, বিশেষ করে আমেরিকায় মানুষ তাদের কুকুরদের মলত্যাগ করানোর জন্য রাস্তায় নিয়ে আসে। কুকুরের বিষ্ঠা অত্যন্ত দূষিত। তা হচ্ছে নানারকম বীজাণুর মহানন্দে বৃদ্ধি পাওয়ার স্থান। কিন্তু মানুষগুলি এতই নির্বোধ যে, সে কথা তারা বিচার করে না; পক্ষান্তরে, তারা সর্বত্রই কুকুরের বিষ্ঠা বিতরণ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও গোময় দেখা যায় না, যদিও বলা হয়েছে যে, গোময় হচ্ছে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র। এখানে দেখা যায় যে, চতুর্দিকে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে লেখা রয়েছে, 'কাগজের

টুকরো ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ।' কিন্তু কুকুরের বিষ্ঠা ছড়ানোতে নিষেধ নেই! বিচার করে দেখ, কত মূর্খ এই লোকগুলি। ঘাসের উপর এক টুকরো কাগজ ফেলা বে-আইনী, কিন্তু কুকুরগুলির মলত্যাগ করতে নিষেধ নেই। এ দেশের সরকার অন্য দেশ থেকে একটা আম পর্যন্ত আনতে দেয় না; কিন্তু তারাই কুকুরগুলিকে সর্বত্র বিষ্ঠা বিতরণ করতে অনুমতি দিচ্ছে, যদিও কুকুরের বিষ্ঠা হচ্ছে নানারকম সংক্রামক রোগের বীজাণুতে পূর্ণ।

মহাশূন্যে অভিযান ঃ সময় এবং অর্থের শিশুসুলভ অপচয়

ডঃ সিং ঃ মহাকাশচারীরা যখন চাঁদ থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে এল, তখন Space programme-এর বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত সতর্ক হয়েছিল, তারা মনে করেছিল যে, মহাকাশচারীরা হয়ত কোন অজ্ঞাত রোগের বীজাণু নিয়ে আসতে পারে, তাই তারা কয়েকদিন মহাকাশচারীদের সংক্রমণ আশঙ্কায় পৃথক করে রেখেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রথমে দেখতে হবে তারা আদৌ চাঁদে গিয়েছিল কি না। সে সম্বন্ধে আমি কিন্তু খুব একটা নিশ্চিত নই। ষোল বছর আগে আমি যখন Easy Journey to Other Planets নামক গ্রন্থটি লিখি, তখন তাতে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, অন্য গ্রহে যাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টাগুলি শিশুসুলভ এবং সেগুলি কোনদিনও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। তার বহু বছর পরে সানফ্রান্সিসকোতে একজন রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করে, "চন্দ্রে অভিযান সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" আমি বলেছিলাম, "এটা কেবল সময় এবং অর্থের অপচয় মাত্র, এ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

কৃষ্ণকান্তি ঃ মহাশূন্যে অভিযানের সময়ে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা সবসময়েই ঘটছে। কি হয়েছিল?

কৃষ্ণকান্তি ঃ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার জন্য ওরা একটা মহাকাশযান পাঠিয়েছিল, যেটি মহাকাশে একটি ঘাঁটির মত কাজ করবে। কিন্তু সেটি বিফল হয়েছে। তার ফলে দু'শ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এভাবে কেন তারা সময় এবং অর্থের অপচয় করছে?

কৃষ্ণকান্তি ঃ সংবাদপত্রে এই নিয়ে তাদের সমালোচনা করা হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা হচ্ছে কতকগুলি মূর্খ শিশুর মত। বিগত কতকগুলি বছর ধরে তারা কি লাভ করেছে? কত বছর ধরে তারা চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে?

ডঃ সিং ঃ দশ বছরের ওপর হবে। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া স্পুটনিক পাঠাতে শুরু করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু তার আগেও বহু বছর ধরে তারা চেষ্টা করছিল। ধরা যাক, গত পঁচিশ বছর ধরে তারা চেষ্টা করে চলেছে। তার ফলে কতকগুলি ধুলো আর পাথর ছাড়া তারা আর কিছুই লাভ করে নি, কিন্তু তবুও তারা চেষ্টা করে চলেছে। কি রকম গোঁয়ার! এদের এই মহাকাশ অভিযান কোনদিনও সফল হবে না।

ডঃ সিং ঃ তারা বলছে যে, ভবিষ্যতে তারা মঙ্গল গ্রহে যেতে চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা সব ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে 'বড় মানুষ' হচ্ছে।

ডঃ সিং ঃ তারা বলছে যে, সেটা তারা দশ বছরের মধ্যেই করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা যদি এক বছরেরও দোহাই দেয়, তাতেই বা কি আসে যায়? তারা বলতে পারে দশ বছর বা এক বছর, কিন্তু এই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলি আমরা গ্রহণ করি না। আমরা দেখতে চাই তারা এখন কি করছে।

ডঃ সিং ঃ ছোট-খাটো মডেল দিয়ে তারা তাদের টেক্‌নোলজির উন্নতি সাধন করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা কেবল ছেলেমানুষী করছে। আমার ছোটবেলায় আমি দেখতাম যে ট্রামগাড়ীগুলি রাস্তা দিয়ে চলে। একদিন আমি

মনে করলাম, "একটা লাঠি নিয়ে আমি রাস্তার উপরের ঝুলন্ত তারটা স্পর্শ করব, তাহলে আমিও লাইন ধরে ট্রামগুলির মত চলতে শুরু করব।" তাদের সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা কত সময়ের অপচয় করছে, আর কত টাকা খরচ করছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাগুলি অর্থহীন, কেননা জীবনের আসল উদ্দেশ্য যে কি, তা তারা জানে না। বৈজ্ঞানিকেরা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, আর রাষ্ট্রনেতারা তাদের সেই টাকাগুলি যোগাড় করে দিচ্ছে। কিন্তু তার ফল হচ্ছে শূন্য। তাদের অবস্থাটা একজন ডাক্তারের মত, যে আসল রোগটা ধরতে পারছে না, কিন্তু তবুও তার রোগীকে সে বলছে, "ঠিক আছে, প্রথমে এই ওষুধটা খান, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে ওই ওষুধটা খাবেন।" ডাক্তারেরা ধরতে পারে না যে আসল রোগটা কি, এবং কি ভাবে যে তার নিরাময় করা সম্ভব, তাও তারা সঠিক বলতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ধাপ্পা দিচ্ছে আর প্রবঞ্চনা করছে। তারা জীবনের আসল সমস্যাগুলি—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির সমাধান করতে পারছে না। তাই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাগুলি সম্পাদিত হচ্ছে কল্পনার স্তরে, সংস্কৃতে যাকে বলা হয় আকাশ-কুসুম। মহাশূন্যে অভিযান করে তাদের সত্যকে জানার চেষ্টা ঠিক আকাশ থেকে ফুল তোলার চেষ্টা করার মত।

আরেকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে মুর্খ হাঁসের মত। ভারতবর্ষে কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটা হাঁস সারাদিন ধরে একটা ষাঁড়কে অনুসরণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঁসটা মনে করছে যে, ষাঁড়ের অণ্ডকোষটা হচ্ছে একটা মাছ। ভারতবর্ষে এটা প্রায়ই দেখা যায়। ষাঁড়টা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সারাদিন ধরে হাঁসটা তার পেছনে পেছনে ঘুরছে আর মনে করছে, "এক সময় ওই বড় মাছটা মাটিতে পড়বে এবং তখন আমি সেটা খাব।"

ত্রয়োদশ প্রাতঃভ্রমণ

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্ এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং, হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণকান্তি দাস অধিকারী এবং আরও কয়েকজন শিষ্য।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্তের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা কে জানে?

হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী ঃ কর্মী তার স্থূল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে চায়, জ্ঞানী সূক্ষ্ম মনের মাধ্যমে—মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা উপভোগ করতে চায়, এবং যোগী যোগ-সিদ্ধির দ্বারা এই জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। এগুলি সমস্তই হচ্ছে জড় শক্তি।

হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী ঃ আর ভক্ত সবরকমের জড়-জাগতিক কামনাবাসনা শূন্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিষ্কাম হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারে না। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগী—এরা সকলেই সকাম, তাই তারা সুখী হতে পারে না। কর্মীরা হচ্ছে সবচাইতে অসুখী, জ্ঞানীরা তার থেকে একটু কম এবং যোগীরা আরও কম। কিন্তু ভক্ত সম্পূর্ণভাবে সুখী—আনন্দময়। কিছু যোগী তাদের যোগ-সিদ্ধির প্রভাবে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য কোনও দেশের গাছ থেকে বেদানা তুলে আনতে পারে। কিছু যোগী আকাশযান ছাড়াই আকাশে উড়তে পারে, আর কিছু যোগী অন্যদের বশীভূত করতে

পারে। এই সমস্ত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে তারপর তারা নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রচার করতে থাকে এবং মূর্খ লোকগুলিও তাদের সেই কথায় বিশ্বাস করে। এই ধরনের ভেল্কিবাজি আমি নিজের চোখে দেখেছি।

কৃষ্ণকান্তি ঃ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কি ভগবানের থেকেও অধিক কৃপালু?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। যথার্থ বৈষ্ণব, যথার্থ ভক্ত কৃষ্ণের থেকেও বেশী কৃপালু। যেমন যীশুখ্রীষ্ট। যীশুখ্রীষ্ট অপরের সমস্ত পাপ গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁকেই তারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। আমরা দেখতে পাই, তিনি কত কৃপালু ছিলেন। আর এখন সমস্ত মূর্খগুলি মনে করছে, "আমি যত ইচ্ছা পাপ করে যেতে পারি, আর যীশুখ্রীষ্ট তো ব্যবস্থা করেই গেছেন—তিনি আমাদের সেই সমস্ত পাপের ফল ভোগ করবেন।" (দীর্ঘ চিন্তামগ্ন নীরবতা।)

জড় এবং চেতনের পার্থক্য

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, গাছেরও চেতনা রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, সেটা ঠিকই। কিন্তু গাছের চেতনা আমার চেতনা থেকে ভিন্ন। আমার চেতনা অধিক উন্নত। তুমি যদি আমার শরীরে একটা চিমটি কাটো, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করব। কিন্তু তুমি যদি একটা গাছকে কেটেও ফেল, তাহলেও সে তার প্রতিবাদ করবে না। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মধ্যেই চেতনা রয়েছে; তবে তার মাত্রার পার্থক্য আছে। চেতনা জড়ের দ্বারা যতই আচ্ছাদিত থাকে, ততই তাকে জড় বলে বিবেচনা করা হয়; আর চেতনা যত উন্নত হয়, ততই তাকে চেতন বলে মনে করা হয়। এটাই হচ্ছে জড় এবং চেতনের মধ্যে পার্থক্য।

আত্মা সর্বত্রই রয়েছে। (আঙ্গুল দিয়ে ঘাসগুলি দেখিয়ে) এগুলি মাটি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। যখনই তারা সুযোগ পায়, তখনই তারা তাদের চেতনা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। যে সমস্ত আত্মা উচ্চতর লোক থেকে অধঃপতিত হয়, তারা কখনও কখনও বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে এসে পড়ে। তারপর তারা ঘাস হয়ে জন্মায় এবং ধীরে ধীরে তারা উন্নততর জীবনে বিবর্তিত হয়।

ডঃ সিং ঃ ওঃ, সেটা ভীষণ কষ্টকর।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটাই হচ্ছে সূক্ষ্ম প্রকৃতির কার্যকলাপ। সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কি জানে? আসলে তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, কিন্তু তারা মনে করছে, "ওঃ, আমি এক বিরাট পণ্ডিত।"

আত্মার স্থানান্তরে রোপণ?

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, হৃদয়ের স্থানান্তরণ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? আমরা জানি যে, হৃদয়ের মধ্যে আত্মা রয়েছে। কিন্তু আজকাল ডাক্তারেরা হৃদয়ের জায়গায় নতুন হৃদয় রোপণ করছে। তাহলে সেই হৃদয়গুলিতে আত্মার কি হয়? কোন মানুষ যখন একটা নতুন হৃদয় পায়, তখন কি তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না।

ডঃ সিং ঃ নয় কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমি যদি একটা চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসি, তখন কি আমার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়? আমি আমার আসন পরিবর্তন করতে পারি, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে আমার পরিবর্তন হল?

ডঃ সিং ঃ কিন্তু হৃদয়ের তো পরিবর্তন হল এবং হৃদয়ে তো আত্মা রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ *বেদ গ্রন্থে* হৃদয়কে আত্মার আসন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যখন হৃদয়ের পরিবর্তন করা হয়, তখন কেবল আত্মার আসনের পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু আত্মা সেই একই থেকে যায়। তারা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, হৃদয়ের পরিবর্তন করার ফলে তারা রোগীর আয়ু বাড়াতে পেরেছে, তাহলে তারা প্রমাণ করতে পারবে যে, তারা আত্মাকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু তারা আয়ু বাড়াতে পারে না, কেননা জীব বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। তুমি এই শরীরটা পেয়েছ এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাকে এই শরীরে থাকতে হবে। তুমি যদি কেবল শরীরের একটা অংশও পরিবর্তন কর, তার ফলে তোমার আয়ুর বৃদ্ধি হবে না। সেটা কখনই সম্ভব নয়। ডাক্তারেরা মনে করে যে, হৃদয়ের পরিবর্তন করে তারা আয়ু বাড়াবে, কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব নয়।

ডঃ সিং ঃ সুতরাং, হৃদয়ের স্থানান্তরণ আত্মার একটি পুরাতন হৃদয় থেকে নতুন একটি হৃদয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার একটা কৃত্রিম দেহান্তর মাত্র?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এটা অনেকটা সেই রকম। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/১৩) কৃষ্ণ তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"আত্মা যেমন নিরন্তর একটি দেহে কৌমার থেকে যৌবন এবং অবশেষে বৃদ্ধ শরীর প্রাপ্ত হয়, তেমনই মৃত্যুর পরে আত্মা আরেকটি শরীরে দেহান্তরিত হয়। আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা তাই এই ধরনের পরিবর্তনে বিচলিত হন না।" হৃদয়ের পরিবর্তন করা জড় দেহের একটি অঙ্গের পরিবর্তন মাত্র। হৃদয় জীবনের উৎস নয়, এবং তাই হৃদয়ের পরিবর্তন করার ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায় না।

ডঃ সিং ঃ হ্যাঁ, হৃদয়ের স্থানান্তরণের জন্য অপারেশন করার পর রোগীরা খুব অল্পক্ষণই বেঁচে থাকে। কিন্তু আত্মাকে এক শরীর থেকে অন্য আরেকটা শরীরে রোপণ করাটা কি সম্ভব?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অনেক সময় কোন কোন যোগী সেটা পারেন। তারা এক শরীর থেকে অন্য আর একটি ভাল শরীরে প্রবেশ করতে পারেন।

ডঃ সিং ঃ ডাক্তারেরা যখন হৃদয়ের স্থানান্তর করে, তখন তারা এমন কোন লোকের হৃদয় নেয়, যে কিছুক্ষণ হল মারা গেছে এবং সেটি দুর্বল হৃদয় বিশিষ্ট কারোর শরীরে লাগিয়ে দেয়। মৃত দেহের হৃদয়ের আত্মাও কি তখন জীবন্ত মানুষের দেহে প্রবেশ করে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। মৃত দেহটির আত্মা ইতিমধ্যেই দেহটি ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং সেই হৃদয়ের মাধ্যমে অন্য আর একটি আত্মার আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ডঃ সিং ঃ আমি আপনার কথাটা আর একটু ভালভাবে বুঝতে চাই। সদ্য মৃত কোন মানুষের হৃদয়টি যখন ডাক্তারেরা বার করে, তখন সেই দেহের আত্মাটি ইতিমধ্যেই হৃদয়টি ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং, তারা যখন সেই মৃতদেহের হৃদয়টি কোন জীবিত রোগীর দেহে রোপণ করে, তখন সেই রোগীর আত্মা সেই নতুন হৃদয়ে প্রবেশ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। আত্মা কোন একটি বিশেষ শরীরে একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য থাকতে পারে। সেই শরীরের যে কোনও অংশ যদি তুমি পরিবর্তন করতে চাও তা করতে পার। কিন্তু তার ফলে সেই শরীরটির আয়ু বাড়বে না।

ডঃ সিং ঃ সুতরাং হৃদয় হচ্ছে একটা যন্ত্রের মত?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সেটি হচ্ছে আত্মার আসন।

সরিষার বস্তায় একটি সরিষা

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, জীব-বিজ্ঞানীরা বলে যে, এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা যৌন-সঙ্গম ব্যতীত সন্তান-প্রজনন করে। বেদ গ্রন্থে কি সে কথা স্বীকার করা হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডঃ সিং ঃ সুতরাং আমরা কি তাদের বংশ-বৃদ্ধি হ্রাস করতে পারি না?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। সেটা আমরা কি ভাবে পারব? কত বিভিন্ন রকমের জীব জীবন উপভোগ করবার জন্য এই জগতে এসেছে, সুতরাং বংশ-বৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকবে। এই জড় জগৎটা হচ্ছে একটা কারাগারের মত। কারাগার কখনও কয়েদী-শূন্য হয় না। একটা কয়েদী যখন বেরিয়ে যায়, তখন সেখানে আরেকজন কয়েদী এসে প্রবেশ করে। সে কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আলোচনা করেছেন। তাঁর এক ভক্ত বাসুদেব দত্ত তাঁকে বলেছিলেন, "দয়া করে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে মুক্ত করে দিন, এবং যদি আপনি মনে করেন যে, তারা এতই পাপী যে তাদের পাপ মোচন করা সম্ভব নয়, তাহলে তাদের সমস্ত পাপ আপনি আমাকে দিন।" কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, "সমস্ত জীবসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অতি নগণ্য। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এটি কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে এক বস্তা সরিষার মধ্যে একটা ছোট সরিষার মত। তুমি যদি একটা সরিষার বস্তা থেকে এক দানা সরিষা তুলে নাও, তাহলে তাতে কি কোন ক্ষতি হয়?" সুতরাং বংশ-বৃদ্ধি হওয়া কখনও বন্ধ হবে না। জীব সংখ্যায় অনন্ত, তাই এই বংশ-বৃদ্ধি চলতেই থাকবে।

ডঃ সিং ঃ আপনি বলেছেন যে, এই জগৎটা একটা কয়েদখানার মত, যেখানে জীবকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কি ভাবে জন্ম-মৃত্যু এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তাই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্দশ প্রাতঃভ্রমণ

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩

এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লসএঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং, ডঃ ডব্লিউ, এইচ, উল্ফ-রোটকে এবং অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য।

মহাশূন্যে বায়বীয় পদার্থের উৎস

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, এক সময় এই পৃথিবীটা ছিল মহাশূন্যে ভাসমান কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ। তারপর কালের প্রভাবে সেগুলি ঘনীভূত হয়ে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তা না হয় হল, কিন্তু এই বায়বীয় পদার্থগুলি এল কোথা থেকে?

ডঃ সিং ঃ তারা বলে সেগুলি সেখানে ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) কৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আটটি পদার্থ হচ্ছে আমার ভিন্ন প্রকৃতি, এই জগতের উপাদান।" এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে, বায়ু এসেছে তাঁর থেকে। বায়ুর থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে খম বা আকাশ, আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে মন, মনের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে অহংকার এবং অহংকারের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে আত্মা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা জানে না। তারা কেবল স্থূল পদার্থগুলিকেই জানে। তারা বায়বীয়

পদার্থের উল্লেখ করে, কিন্তু সেই বায়বীয় পদার্থগুলি এল কোথা থেকে?

ডঃ সিং ঃ সে প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু তার উত্তর আমরা দিতে পারি। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি যে, বায়বীয় পদার্থ এসেছে আকাশ থেকে। আকাশের উদ্ভব হয়েছে মন থেকে, মনের উদ্ভব হয়েছে বুদ্ধি থেকে, বুদ্ধির উদ্ভব হয়েছে অহংকার থেকে এবং অহংকারের উদ্ভব হয়েছে আত্মা থেকে।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক করে যে, ডারউইনের জৈব বিবর্তনের পূর্বে প্রাক্‌জৈবিক বা রাসায়নিক বিবর্তন হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। এখন এই 'রাসায়নিক বিবর্তন' মানে হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থগুলিরও একটা উৎস আছে, এবং সেই উৎসটি হচ্ছে আত্মা বা জীবন। লেবু সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, এবং আমাদের দেহ মূত্র, রক্ত ইত্যাদিতে নানারকমের রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবন থেকে রাসায়নিক পদার্থের উৎপন্ন হয়, এমন নয় যে রাসায়নিক পদার্থগুলি থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল।

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, জীবনের বীজ যখন কোষের মধ্যে বর্তমান থাকে, তখন জীব আপনা থেকেই বর্ধিত হয় এবং কার্যকরী হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। কিন্তু এই বীজটি কে প্রদান করেন? *ভগবদ্গীতায়* (৭/১০) সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্*— অর্থাৎ, "হে পার্থ! জেনে রাখ যে, আমিই হচ্ছি সমস্ত প্রাণীর মূল বীজ।" আর তারপর তিনি আবার বলেছেন,

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

(ভগবদ্গীতা ১৪/৪)

"হে কুন্তী পুত্র! জেনে রাখ যে, এই জড় জগতে সমস্ত জীবের জন্ম সম্ভব হয়েছে, কেননা আমিই হচ্ছি প্রকৃতিরূপী মহৎ যোনিতে বীজ প্রদানকারী পিতা।"

আদি স্রষ্টাকে কৃতিত্ব দান

ডঃ উল্‌ফ-রোটকে ঃ কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ, গভীর বিনয়ের সঙ্গে আমি বলতে চাই, বৈজ্ঞানিকেরা যদি কৃত্রিম উপায়ে একটা জীবকোষ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে আপনি কি বলবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাতে তাদের কৃতিত্ব কোথায়? প্রকৃতিতে ইতিমধ্যে যা রয়েছে তারা কেবল তার অনুকরণ করবে মাত্র। মানুষ অনুকরণ করতে খুব ভালোবাসে। নাইট ক্লাবে যখন একটা লোক একটা কুকুরের অনুকরণ করে ডাকে, তখন তাকে দেখবার জন্য মানুষ পয়সা দিয়ে সেখানে যায়। কিন্তু তারা যখন একটা কুকুরকে ডাকতে শোনে, তখন তার প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপও করে না।

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, রাসায়নিক বিবর্তনের ধারণাটি এসেছিল ১৯২০ সালে একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, জৈব রাসায়নিক বিবর্তন শুরু হওয়ার আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, অর্থাৎ তা মূলতঃ হাইড্রোজেনে পূর্ণ ছিল এবং তাতে অতি অল্প মাত্রায় অক্সিজেন ছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে সূর্যকিরণের প্রভাবে এই হাইড্রোজেন অণুগুলি থেকে নানারকম রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটা একটা আংশিক পর্যবেক্ষণ। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, এই হাইড্রোজেনগুলি এল কোথা থেকে? বৈজ্ঞানিকেরা কেবল মধ্যবর্তী অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে, তারা উৎস সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করে না।

অলৌকিক টেলিভিশন

ডঃ সিং ঃ এখন তারা অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে যা পূর্বে ছিল না। যেমন টেলিফোন, টেলিভিশন, এরোপ্লেন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং এরকম অনেক নতুন নতুন জিনিস।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু এর থেকে অনেক ভাল টেলিফোন রয়েছে, যে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে তার সামনে বসে অনেক দূরে কুরুক্ষেত্রে কি ঘটছিল তার বর্ণনা করছিলেন; সে কথা *ভগবদ্গীতায়* আছে। সঞ্জয়ের দর্শনের ক্ষমতা টেলিভিশনের থেকে অনেক উন্নত ছিল। সেটা হচ্ছে অলৌকিক টেলিভিশন। এটা হচ্ছে হৃদয়ের টেলিভিশন, তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে একটা ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি সেখানে কি ঘটছিল তা সব দেখতে পাচ্ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "আমার পুত্রেরা ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা, এখন কি করছে? তারা এখন কেমন আছে?" তখন সঞ্জয় বর্ণনা করলেন কি ভাবে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গেল, এবং দ্রোণাচার্য তাকে কি বললেন, তখন দুর্যোধন কি উত্তর দিল ইত্যাদি। যদিও সেই সমস্ত ঘটনা ঘটছিল সাধারণ মানুষেরা দৃষ্টিশক্তি থেকে অনেক দূরে, তবুও সঞ্জয় তার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তা দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার বর্ণনা করছিলেন। সেটাই হচ্ছে যথার্থ বিজ্ঞান।

ডঃ সিং ঃ অনেক বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, আমরা প্লাস্টিক তৈরী করে, ওষুধ আবিষ্কার করে অনেক উন্নতি সাধন করেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৈদিক যুগে মানুষ সোনার থালায় বা রূপার থালায় খেত, কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রভাবে মানুষ প্লাস্টিকের থালায় খাবার খাচ্ছে। (হাস্য)

ডঃ সিং ঃ প্লাস্টিক আসলে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অব্যবহার্য প্লাস্টিকগুলি জমা হচ্ছে এবং সেগুলি ওরা না পারছে পুনর্ব্যবহার করতে, আর না পারছে ফেলে দিতে। সুতরাং ক্রমান্বয়ে এগুলি স্তূপীকৃত হচ্ছে।

প্রমাণ আমাদের রয়েছে

ডঃ উল্‌ফ-রোটকে ঃ জড়বাদীরা যদি বলত, "যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেই স্বপ্ন থেকে আমরা জেগে উঠতে চাই না। আমাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে, ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করার চেষ্টা করতে চাই।" তাহলে অন্তত বোঝা যেত যে, তারা সৎ। কিন্তু তারা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করার সমস্ত প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটাই হচ্ছে তাদের মূর্খতা। অবশেষে এক সময় না এক সময় তাদের স্বীকার করতেই হবে।

ডঃ উল্‌ফ-রোটকে ঃ কিন্তু তারা বলে, "বারবার চেষ্টা করে যাও।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু চেষ্টা তারা করবে কি করে? তোমার চোখে ছানি পড়ার ফলে তুমি যদি দেখতে না পাও, তাহলে তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন তুমি কোনদিনও দেখতে পাবে না। দেখার চেষ্টা করলেই কি চোখের ছানি সেরে যাবে? না। সে ভাবে কোনদিনও তার নিরাময় হতে পারে না। তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, যিনি তোমার চোখ অপারেশন করে তোমাকে আবার দৃষ্টি ক্ষমতা দান করবেন। কেবল নিজে নিজেই চেষ্টা করে কোনদিনও তুমি দেখতে পাবে না।

ডঃ উল্‌ফ-রোটকে ঃ সেটাই তারা স্বীকার করতে চায় না যে, ভৌতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্যকে জানার সমস্ত চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ওরা সমস্ত মূর্খ। ওরা সদুপদেশ গ্রহণ করবে না। তুমি যদি কোন মূর্খকে সদুপদেশ দাও, তাহলে সে রেগে যাবে—ঠিক একটা সাপের মত। তুমি যদি একটা সাপকে তোমার বাড়ীতে এনে বল, "হে ভাই সাপ! দয়া করে তুমি আমার বাড়ীতে থাক। প্রতিদিন আমি তোমাকে খুব সুন্দর সুন্দর খাবার দেব—দুধ-কলা দেব।" সাপ তাহলে খুব খুশী হবে, কিন্তু তার পরিণামে একসময় সে ফোঁস করে তোমাকে ছোবল মারবে।

ডঃ উল্‌ফ-রোটকে ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোনদিনও তাদের আশা ছাড়বে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাদের সমস্ত পরিকল্পনাগুলি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ হচ্ছে, কিন্তু তবুও তারা আশা করে যাচ্ছে।

শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, একজন লাইব্রেরীয়ান আমাকে *ভগবদ্‌গীতা* যে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন তা প্রমাণ করতে বলেছিল। পাঁচ হাজার বছর আগেকার লেখা একটা *ভগবদ্‌গীতা* সে দেখতে চেয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অন্ধকার ঘরে পড়ে রয়েছে যে লোকটি, তাকে গিয়ে আমি যদি বলি, "সূর্য উঠেছে, এখন বেরিয়ে এসো।" আর সেই লোকটি যদি বলে, "সূর্য যে উঠেছে তার প্রমাণ কি? প্রথমে তুমি সেটা আমার কাছে প্রমাণ কর, তারপরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসব।" তখন আমি যুক্তি প্রদর্শন করতে পারি, "দয়া করে শুধু একটু বেরিয়ে এসো, তাহলেই তুমি দেখতে পাবে যে সূর্য উঠেছে।" কিন্তু সে যদি সেই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে না চায়, সে যদি প্রমাণের প্রতীক্ষা করে অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকতে চায়, তাহলে তুমি তাকে বোঝাবে কি করে? তেমনই তুমি যদি *ভগবদ্‌গীতা* পড়, তাহলেই তুমি সবকিছু দেখতে পাবে। তোমার অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসো, তাহলেই তুমি দেখবে যে প্রমাণ রয়েছে।

ষোড়শ প্রাতঃভ্রমণ

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩
এই আলোচনাটি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল
লস্‌এঞ্জেলেসের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ সিং,
হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী এবং অন্য কয়েকজন শিষ্য।

'পরম' কথাটির অর্থ

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই জড় জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার অর্থ কি? তোমাদের রাষ্ট্রে তোমরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে প্রধানতম ব্যক্তি বলে গণ্য করছ কেন?

ডঃ সিং ঃ কেননা তাঁর কিছু ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। এবং তিনি প্রধান কেন? কেননা তিনি হচ্ছেন সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাই তিনি সবচাইতে বেশী বেতন পান, তিনি সবচাইতে ভাল সুযোগ-সুবিধা পান এবং তাঁর আদেশই হচ্ছে চূড়ান্ত।

ডঃ সিং ঃ তাঁর মধ্যে অন্যকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। তুমি তাঁর সঙ্গে একমত নাও হতে পার, কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান, তাই তোমাকে তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে। এমনই হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা। তুমি তাঁকে স্বীকার কর বা না কর, তাতে কিছু যায় আসে না। এটাই হচ্ছে 'প্রাধান্য' কথাটির অর্থ, তাই নয় কি? বৈদিক শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে, যাঁর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করার ক্ষমতা রয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভাগ্যবান, এবং পরম সৌভাগ্যবান হচ্ছেন ভগবান। *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং*— "শত

সহস্র লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁর সেবা করছেন।" (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/২৯) এই জগতে আমরা লক্ষ্মীদেবীর একটু কৃপা লাভ করার জন্য কত আকুলভাবে প্রার্থনা করছি। কিন্তু শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর কৃষ্ণের আরাধনা করছেন।

ডঃ সিং ঃ এমন সৌভাগ্যবান কারোর কথা অনুমান করা আমাদের কল্পনারও অতীত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন অচিন্ত্য, চিন্তার অতীত। তিনি যে কত মহান অথবা কত সৌভাগ্যবান, তা আমরা চিন্তাও করতে পারি না! 'অচিন্ত্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'যা চিন্তা করা যায় না।" আমরা ভগবানের ঐশ্বর্যের কেবল একটি অংশ—এই জড়া প্রকৃতি—দেখতে পাই, যা হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির আংশিক প্রকাশ। ভগবানের অনন্ত শক্তি রয়েছে। তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি রয়েছে এবং উৎকৃষ্ট শক্তি রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) কৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না প্রকৃতি এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।" *ভগবদ্গীতায়* তার পরের শ্লোকে কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পরা-প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তি হচ্ছে চিৎ জগৎ। সুতরাং নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতিতে যদি এত অদ্ভুত সমস্ত জিনিস থাকতে পারে, তাহলে পরা-প্রকৃতি বা ভগবদ্ধাম যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে যে কত অদ্ভুত সমস্ত জিনিস রয়েছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এটাই হচ্ছে 'পরা' বা 'পরম' কথাটির অর্থ।

যোগশক্তির রহস্য

হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী ঃ এই পৃথিবীতে যে আমরা বিভিন্ন রকমের সমস্ত প্রাণী দেখছি, চিৎ জগতেও কি সেই সমস্ত রয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। আর তাছাড়া, এই নিকৃষ্ট প্রকৃতিতে যদি এত সমস্ত অদ্ভুত প্রাণী থাকে, তাহলে অনুমান করে দেখ চিন্ময় জগতে কত রকমের আশ্চর্যজনক সব উন্নত স্তরের জীব রয়েছে! এই জড় ব্রহ্মাণ্ডেও কোন কোন গ্রহের জীব অন্য গ্রহের জীব থেকে অনেক বেশী উন্নত। যেমন, এই পৃথিবীর মানুষেরা অলৌকিক শক্তি লাভ করবার জন্য যোগ অভ্যাস করে, কিন্তু সিদ্ধলোক নামক গ্রহের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত যৌগিক সিদ্ধি লাভ করেন। এই পৃথিবীতেই আমরা দেখি যে, পাখীরা অনায়াসে আকাশে উড়তে পারে; কিন্তু আমরা পারি না। আমাদের উড়তে হলে অনেক টাকা খরচ করে এরোপ্লেনে চড়তে হয়। কিন্তু সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা কোনরকম যন্ত্র ছাড়াই এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে উড়ে যেতে পারেন। এই পৃথিবীতেও অনেক যোগী আছেন, যাঁরা প্রতিদিন সকালে চারটি জায়গায়—জগন্নাথ পুরী, রামেশ্বর, হরিদ্বার এবং দ্বারকায় একই সময়ে স্নান করতে পারেন। আমার পিতৃদেবের একজন যোগী বন্ধু প্রায়ই কলকাতায় তাঁর কাছে আসতেন। সেই যোগীটি আমার পিতৃদেবকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন আসনে বসে তাঁর গুরুদেবকে স্পর্শ করেন, তিনি তখন দুমিনিটের মধ্যেই কলকাতা থেকে দ্বারকায় চলে যেতে পারেন। এটাই হচ্ছে যোগ-শক্তি। সুতরাং আধুনিক এরোপ্লেন আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিকদের গর্ব করার কি কোন কারণ আছে? দুর্বাসা মুনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করে বৈকুণ্ঠ লোক পর্যন্ত গিয়েছিলেন মাত্র এক বছরের মধ্যে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হিসাব অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কতকগুলি গ্রহ রয়েছে,

যেগুলি এই পৃথিবী থেকে ৪০ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ, কেউ যদি আলোকের গতিতে ভ্রমণ করে, তাহলে সেই গ্রহে পৌঁছতে তার ৪০ হাজার বছর লাগবে। তাদের যদি সেখানে যাওয়ার ক্ষমতাও থাকত, তবু ৪০ হাজার বছর তারা বাঁচবে কি করে? সুতরাং তাদের গর্ব করার কি আছে?

ডঃ সিং ঃ বৈজ্ঞানিকদের একটি মতবাদ রয়েছে যে, তারা আলোকের গতিতে ভ্রমণশীল একটি যন্ত্র তৈরী করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটা হচ্ছে তাদের মূর্খতা। তারা যদিও তা বলছে, কিন্তু সেটা তারা কোনদিনও করতে পারবে না।

বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অনেক গ্রহ এবং নক্ষত্র রয়েছে, যাদের দেখা যায় না। যেমন রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রের সামনে দিয়ে যায় তখন গ্রহণ হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এই গ্রহণকে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে। প্রকৃতপক্ষে, রাহু গ্রহের প্রভাবে গ্রহণ হয়। গ্রহণ সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। বৈদিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশ্লেষণ ভ্রান্ত।

ডঃ সিং ঃ কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, তাদের সেই মতবাদ তারা প্রমাণ করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা বলে যে, বিজ্ঞান সবকিছু প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু সেটা তাদের অর্থহীন প্রলাপ। তারা নিজে কি, সেটা ছাড়া বৈজ্ঞানিকেরা আর সবই প্রমাণ করছে। 'সেটা' তারা জানে না। তাদের মৃত্যু হয় কেন? তাও তারা জানে না। এই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধি।

ডঃ সিং ঃ তারা এই ব্রহ্মাণ্ডের একটা মডেল তৈরী করতে পারে। তারা এই সমস্ত গ্রহগুলির এবং চাঁদের মডেল তৈরী করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাই যদি তারা পারে, তাহলে তারা একটা নকল সূর্য তৈরী করে ইলেকট্রিসিটি বাঁচাক না। এই সমস্ত মূর্খগুলি কেবল অনর্থক প্রলাপ বকে, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে না। সেটাই হচ্ছে তাদের অবস্থা। তারা যদি ব্রহ্মাণ্ডের মডেল তৈরী করতে পারে, তাহলে তারা একটা বড় সূর্যের মডেল তৈরী করুক। তাহলে আর রাত্রিবেলা বৈদ্যুতিক আলোকের জন্য এত পয়সা খরচ করতে হবে না। কিন্তু তা তারা পারে না। কিন্তু তবু মানুষকে প্রতারণা করবার জন্য, তাদের থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তারা কেবল বড় বড় কথা বলতে পারে। তারা বলে যে, তারা চন্দ্রের উপাদান, সূর্যের উপাদানগুলি সম্বন্ধে জানে, তাহলে তারা সেগুলি তৈরী করতে পারছে না কেন? তারা একটা কৃত্রিম সূর্য তৈরী করুক, যাতে আইসল্যাণ্ড এবং গ্রীনল্যাণ্ডের লোকেরা প্রবল ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ভগবান শূন্য নন

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একসময় চিন্তামণি নামক একটি রত্নের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়, কিন্তু রত্নটির কোন পরিবর্তন হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

(ঈশোপনিষদ মঙ্গলাচরণ)

এই শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে, যদিও সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কখনও ক্ষয় হয় না। এই পৃথিবীতে তেল শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলে এক ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু সূর্য এখনও দেদীপ্যমান এবং অনন্তকাল ধরে তা দেদীপ্যমান থাকবে। আর কৃষ্ণ এরকম কোটি কোটি সূর্য সৃষ্টি করতে পারেন; বাস্তবিক তিনি তা করছেনও। কিন্তু তবুও তাঁর শক্তির কোন ক্ষয় হয় নি—তিনি পূর্ণরূপে শক্তিমান। এটিই হচ্ছে ভগবানের বৈশিষ্ট্য, এবং এটিই হচ্ছে ভগবানের শক্তি, অচিন্ত্য শক্তি।

আমাদের খরচ করার মত কিছু টাকা থাকে, এবং তার পরের দিনই আমাদের সমস্ত টাকা খরচ হয়ে গিয়ে সবকিছু শূন্য হয়ে যায়। মূর্খরা বলে যে, পরম-তত্ত্ব হচ্ছে শূন্য, তাদের মতবাদ হচ্ছে শূন্যবাদ। তারা জানে না যে ভগবান কখনই শূন্য নন—তিনি সর্বদাই পূর্ণ। তাই ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হবে। ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের কর্তব্য হচ্ছে—মূর্খ এবং নির্বোধের দ্বারা প্রতারিত না হয়ে বৈদিক শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। ভগবান এবং তাঁর পূর্ণ শক্তির বিশদ বিশ্লেষণ বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানের শক্তির ক্ষয় হয় না। এখানেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। একজন যুবক যেমন অনায়াসে জোরে জোরে হাঁটতে পারে এবং অন্য অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু আমি তা আর পারি না। কেননা আমার যৌবনের শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু ভগবান সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন।

অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্ অনন্তরূপম্
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্ব, তিনি হচ্ছেন অচ্যুত এবং অনাদি। তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং তাঁর রূপ সর্বদাই নবযৌবন সম্পন্ন।" (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৩৩) *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) কৃষ্ণও বলেছেন, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং*

হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি— "পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন।" তিনি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও রয়েছেন। কিন্তু তবুও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এরকমই হচ্ছে ভগবানের ভগবত্তা। এবং তিনি অদ্বৈত, অর্থাৎ তিনি একক। এমন নয় যে তোমার হৃদয়ে তিনি রয়েছেন এবং অন্য আরেকজন আমার হৃদয়ে রয়েছেন। না, তিনি এক। তিনি সর্বব্যাপ্ত। আবার তিনি একস্থানেও স্থিত; কিন্তু তবুও তিনি হচ্ছেন এক।

কৃষ্ণপ্রেমের অপ্রাকৃত প্রকৃতি

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্বমূলক কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন প্রেম (God is Love)।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ভগবান সবকিছু। তারা কেন বলতে চায় যে, ভগবান এটা বা ভগবান ওটা? সবকিছুই ভগবান, কেননা ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্ব। তাঁর প্রেম এবং তাঁর শত্রুতা—এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় জগতে আমরা প্রীতি এবং শত্রুতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করি। কিন্তু ভগবানের শত্রুতা এবং ভগবানের প্রেম একই বস্তু। তাই তাঁকে বলা হয় অচিন্ত্য। ব্রজগোপিকারা এবং কংস উভয়েই চিৎ জগতে ফিরে গিয়েছিলেন। পুতনা কৃষ্ণকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে এসেছিল, আর মা যশোদা সর্বক্ষণ দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয় সেজন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন। সুতরাং, মা যশোদা এবং পুতনা হচ্ছেন সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তাঁরা উভয়েই পরিণামে একই ফল লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ মনে করেছিলেন, "আমি পুতনার স্তন পান করেছি, অতএব সে এখন আমার মাতৃস্থানীয়া। সুতরাং, সেও মা যশোদার মত একই পর্যায়ভুক্ত।" এটাই হচ্ছে কৃষ্ণের বিদ্বেষ এবং কৃষ্ণের অনুরাগের পরম প্রকৃতি।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যে সমস্ত তত্ত্ববিদেরা পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সেই অদ্বয় তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান বলে সম্বোধন করেন।" (ভাঃ ১/২/১১) ভগবানের নির্বিশেষ, সর্বব্যাপ্ত রূপ রয়েছে—তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ সচ্চিদানন্দময় সবিশেষ ভগবান। তাঁর এই তিনটি রূপ ভিন্ন, কিন্তু একই সময়ে আবার অভিন্ন। এরকমই হচ্ছে ভগবানের প্রকৃতি, অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—যুগপৎভাবে ভিন্ন এবং অভিন্ন। যিনি ভগবানের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করেছেন, তিনি আপনা থেকেই ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে জেনে গেছেন। তাঁরা সবকিছুর মধ্যেই কৃষ্ণকে দর্শন করেন, আবার তাঁর মধ্যে পার্থক্যও নিরূপণ করতে পারেন—একাধারে এক এবং ভিন্ন।

তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা

ডঃ সিং ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, অনেক মানুষই ভগবানকে মেনে নিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা রোগগ্রস্ত, এবং তারা সেই রোগের চিকিৎসাও করাতে চায় না; তারা যদি চিকিৎসা না করাতে চায়, তাহলে সেটা তাদের দোষ। যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়—ভগবান সম্বন্ধে সচেতন নয়—সে উন্মাদ। মায়াশক্তির প্রভাবে—এই নিকৃষ্ট জড়া শক্তির প্রভাবে সে কেবল ভূতে পাওয়া মানুষের মত অর্থহীন প্রলাপ বকে। তুমি যদি জ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাকে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের কাছে যেতে হবে। সেইরকম একজন পুরুষ, একজন গুরু খুঁজে পেতে হবে এবং তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তারপর তাঁকে

প্রশ্ন কর এবং তিনি যে উত্তর দেন, সেগুলি তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। সেইটি হচ্ছে ভগবানকে জানার পন্থা। প্রথমে তোমাকে একজন গুরু খুঁজে পেতে হবে, তারপর তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে সেবা করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে, তখন গুরুদেব সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান দান করবেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"তত্ত্বজ্ঞানী সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে এই জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনীতভাবে তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ঐকান্তিকভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন কর এবং ঐকান্তিক সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্‌গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান দান করতে পারেন, কেননা তিনি সত্যকে দর্শন করেছেন।"

প্রমাণ করুন!

ডঃ অ্যাব্রাহাম টি কভুর হচ্ছেন Sri Lanka Rationalist Association-এর প্রেসিডেন্ট। এই সংস্থাটি বিশেষভাবে প্রচার করার চেষ্টা করছে যে, ভগবানের ও আত্মার অস্তিত্ব নেই। ১৯৭৭ সালের ১৪ই আগস্ট কলম্বোর SUNDAY TIMES "Is There Life After Death?" (মৃত্যুর পরেও কি জীবন আছে?) নামক ডঃ কভুরের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধটিতে ডঃ কভুর বলেন যে, জীবন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং মৃত্যুর পরে আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না কেননা আত্মা বলে কোন বস্তুই নেই। এই প্রবন্ধটি নিয়ে ডঃ কভুরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের শ্রীলঙ্কা শাখার ভক্তদের খুব উষ্ণ তর্ক-বিতর্ক হয়। SUNDAY TIMES-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির কিছু অংশ এবং সেই সম্বন্ধে লিখিত চিঠিপত্রগুলির কিছু অংশ এখানে প্রকাশিত হল।

Sunday Times
August 21, 1977

ডঃ কভুরের দর্শনশক্তির অতীত

(শ্রীল হংসদূত স্বামী এবং মহাকান্ত দাস লিখিত)

যদিও ডঃ কভুরের মত লোকেরা তাদের তথাকথিত জ্ঞানের ভিত্তিতে গর্বভরে প্রতিষ্ঠিত, নিরীহ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য এটা তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি যে ডঃ কভুরের মত লোকেরা যদিও নিজেদের তথাকথিত জ্ঞানের ধারক ও বাহক বলে প্রচার করার চেষ্টা করেন কিন্তু আসলে তাঁরা একটা নিমজ্জমান তরণীর

ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। বিশেষ করে তাঁরা যখন তাঁদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় নিয়ে—যে বিষয়ে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে যান। বিশেষ করে তাঁরা যখন মৃত্যুর পরে জীবনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার সাহস করেন।

ডঃ কভুর তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন, "আমি বিশ্বাস করি না যে আমার জীবন আমার শরীরের কোন বিশেষ অংশে অবস্থিত।" এই উক্তিটি এবং পরবর্তী একটি উক্তি—"আমি বিশ্বাস করি না যে আমার আত্মা নামক একটি বস্তু আছে, মৃত্যুর পরেও যার অস্তিত্ব থাকে"—তাঁর এই উক্তিগুলি থেকেই বোঝা যায়, যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞানই নেই। সমস্ত প্রবন্ধটি জুড়ে ডঃ কভুর এমন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস এবং মতামত প্রকাশ করছেন যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত, এবং তিনি তাঁর মনগড়া কতকগুলো জল্পনা-কল্পনাকে অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে চালাবার চেষ্টা করছেন।

ডঃ কভুরকে আমরা একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, ইন্দ্রিয়ভিত্তিক যে জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মৃত্যুর পরে জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা অত্যন্ত সীমিত এবং ভ্রান্ত।

উদাহরণ— যেমন ধরুন, আমাদের চোখ। কতকগুলি বিশেষ অবস্থাতেই তারা কার্য করে যদি আলো না থাকে তাহলে সেই চোখ দিয়ে আমরা আমাদের হাত পর্যন্ত দেখতে পাই না। আমার চোখের সবচাইতে কাছের যে বস্তু—চোখের পাতা—তাও আমরা দেখতে পাই না, আর অনেক দূরের যে জিনিস তাও আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারি না। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের চোখ দিয়ে যে দেখা তা কত ভ্রান্ত। তেমনই কান, নাক, ত্বক আদি ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের যে অনুভূতি সেগুলিও অত্যন্ত সীমিত;

আর আমাদের মনও ভ্রান্ত। তাই কেবল ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে যে জ্ঞান তা যে ভ্রান্ত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক যত সমস্ত গবেষণা এবং জল্পনা-কল্পনা তা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি শিশু যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তার পিতৃপরিচয় জানতে চায় তাহলে সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃপরিচয় জানতে হলে তা জানতে হবে মায়ের কাছ থেকে—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষকে এটা মেনে নিতেই হবে। তেমনই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান জড়-ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে লাভ করা যায় না। তা লাভ করতে হয় শাস্ত্রের মাধ্যমে।

আত্মা এবং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ডঃ কভুর লিখছেন, "সে সম্বন্ধে বিশ্বাস করার কোন উপযুক্ত কারণ বা প্রমাণ আমি দেখতে পাইনি।" তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান কত সীমিত এবং ভ্রান্ত এবং তাই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে তা প্রয়োগ করা যায় না। তাই মূর্খের মত "মৃত্যুর পরেও আমার আত্মার অস্তিত্ব থাকবে তা আমি বিশ্বাস করি না।" এই কথা না বলে ডঃ কভুর যদি সরলভাবে স্বীকার করতেন যে এই বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য তাঁর নেই তাহলে একটা মস্ত বড় মিথ্যার অপপ্রচার আজ বন্ধ হত। আত্মার অস্তিত্ব আছে, আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং পরমেশ্বর ভগবান আছেন। সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তার কারণ হচ্ছে আত্মা জড়-পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে যদি তার অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি জানার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা নিষ্ফল হবে; জড়াতীত আত্মাকে জড় অনুভূতি বা যন্ত্রের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এর অর্থ এই নয় যে, যেহেতু এই বিষয়টি ইন্দ্রিয়াতীত তাই সে সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছামত কল্পনা এবং মতামত প্রকাশ করা যাবে, যা আধুনিক যুগে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জড় বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য যেমন জড় বিজ্ঞান আছে, তেমনই চিন্ময় বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য চিন্ময় বৈজ্ঞানিক পন্থা রয়েছে যা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় পদার্থের আবরণ ভেদ করে সরাসরিভাবে চিন্ময়-বস্তু আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

যথার্থ বৈজ্ঞানিক কখনই অন্ধের মত ঘোষণা করে না, "আমি বিশ্বাস করি না যে আত্মা নামক একটি বস্তু আছে, যার অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেও থাকবে।" পক্ষান্তরে তিনি উদ্যমের সঙ্গে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেন। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক এবং ঐকান্তিক তত্ত্ব অনুসন্ধানী সেই পন্থা অবলম্বন করে তত্ত্বজ্ঞান আহরণে প্রয়াসী হন। অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানের অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে সেই জ্ঞান আহরণ করার বিষয়ে নিজেকে নিযুক্ত করার পরেই কেবল তিনি সেই বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। Theory, observation এবং experimentation হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের পন্থা, এবং চিন্ময় বিজ্ঞানের বিষয়েও সেটি প্রয়োগ করা কর্তব্য।

আধুনিক যুগে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রচার করার চেষ্টা করছে যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবনের থেকেই জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। একজন জীবন্ত পুরুষের সঙ্গে একজন জীবন্ত স্ত্রীর সঙ্গমের ফলেই একটি জীবন্ত শিশুর জন্ম হয়। একজন মৃত পুরুষের সঙ্গে একজন মৃত স্ত্রীর সমন্বয়ে কখনও

কোনও সন্তানের জন্ম হয়েছে তা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। একটি জীবন্ত গাছ থেকেই কেবল ফল পাওয়া যায়; কিন্তু একটা মৃত গাছের সে ক্ষমতা নেই। জীবন্ত এবং মৃতের পার্থক্য হচ্ছে—দেহে আত্মার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এই আত্মা সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে পরাপ্রকৃতি সম্ভূত। এই পরাপ্রকৃতি সম্ভূত আত্মার প্রভাবেই এই জড়া প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু বৈজ্ঞানিক বলে থাকেন যে, জীবন কেবল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় মাত্র। সেটাই যদি হত তাহলে একটি মৃত শরীরে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কেন সেই মৃত শরীরটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারছেন না? জড় শরীরের সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি কোন বৈজ্ঞানিককে দেওয়া হলেও সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির সমন্বয়ের ফলেও কেন তাঁরা সন্তান সৃষ্টি করতে পারছেন না?

এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সেই সমস্ত জড় বিজ্ঞানীরা উত্তর দেন, "আমরা চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে সেটা করতে আমরা সক্ষম হব।" কিন্তু এই সমস্ত অজুহাত বিজ্ঞান নয়। এটা হচ্ছে প্রতারণা।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা গর্বভরে ঘোষণা করেন, "আত্মা বলে কোন বস্তু নেই। ভগবান নেই। ঘটনাক্রমে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে।" কিন্তু তাঁদের এ সমস্ত মন্তব্য যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার কথা যখন তাঁদের বলা হয়, তখন তাঁরা কেবল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে, "আমরা চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে সেটা করতে আমরা সক্ষম হব।" এই ডঃ কভুর হচ্ছেন একজন এই ধরনের আদর্শ জড়বৈজ্ঞানিক, তাই তাঁদেরই মত ধাপ্পা দিয়ে তিনি বলছেন, "অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ প্রজনন সম্বন্ধীয় অতি উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে এক অতি উন্নত স্তরের জীব সৃষ্টি করবে।"

আমরা ডঃ কভুরকে চ্যালেঞ্জ করছি। তাঁর রাসায়নিক পদার্থগুলি একটা মৃতদেহে inject করে সেই মৃতদেহটিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করুন। অথবা সেই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি তাঁর নিজের শরীরে inject করিয়ে তিনি তাঁর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে প্রতিহত করুন অথবা তাঁর জরাগ্রস্ত অকেজো শরীরটাকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে যৌবনত্ব প্রদান করুন।

এই কাজটা যদি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়, তাহলে তিনি অন্ততঃ একটা মশা বা একটা ছারপোকা সৃষ্টি করুন। তার থেকেও ভাল হয় যদি তিনি যে পতঙ্গটির শিরশ্ছেদ করেছেন, তার দেহের রাসায়নিক পদার্থগুলির সমন্বয় করে সেই পতঙ্গটিকে পুনরুজ্জীবিত করুন (যা তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন।) নাকি ডঃ কভুরের বিজ্ঞান একটা একতরফা ধ্বংসাত্মক পথ মাত্র?

হয়ত আধুনিক বিজ্ঞান ততটা উন্নত হয়নি যে এখনই পূর্ণরূপে জীবনের সৃষ্টি করবে। সেটাই যদি হয় তাহলে ডঃ কভুর অন্ততঃ একটা প্লাস্টিকের ডিম বানিয়ে তাতে হলদে আর সাদা রাসায়নিক পদার্থগুলি ঢুকিয়ে তা থেকে একটা অন্ততঃ মুরগীর সৃষ্টি করুন যা প্রতিদিন একটা করে ডিম পাড়বে এবং তার থেকে অনেক অনেক মুরগীর ছানা সৃষ্টি হবে।

হয়ত এ কাজটাও ডঃ কভুরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ঠিক আছে, তাহলে অন্ততঃ তিনি হয়ত তাঁর সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির সমন্বয়ের ফলে একফোঁটা দুধ বা একদানা চাল সৃষ্টি করতে পারবেন। যদি তিনি সেটা করতে পারেন তাহলে তাঁর দাবীগুলোর যে কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারব।

সকলেই জানেন যে তথাকথিত সবচাইতে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও এই কাজটা অসম্ভব। আমরা জানি যে এর উত্তরে ডঃ কভুর অনেক বড় বড় কথার সমন্বয় করে অনেক বড় বড় ধাপ্পা দিয়ে পাঠককে

হতভম্ব করার চেষ্টা করবেন। এবং তার সেই সমস্ত কথার সারমর্ম হবে, "ভবিষ্যতে আমরা সেটা করব। আমরা চেষ্টা করছি।" এবং যে ভাষাতেই সেটা বলা হোক্ না কেন সেটা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইতি,
বিনীত
হংসদূত স্বামী
মহাকান্ত দাস
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ।

Sunday Times
August 28, 1977

ডঃ কভুরের দর্শনশক্তির অতীত নয়

(ডঃ অ্যাব্রাহাম কভুর লিখিত)

২১শে আগস্ট সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় "It is beyond Kavoor's Power of Observation" শীর্ষক প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের হংসদূত স্বামী এবং মহাকান্ত দাস আধুনিক জীববিজ্ঞান, আণবিক জীববিজ্ঞান, নিউরো-বায়লজি ইউজেনিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এক্সট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন, পার্থিনোজেনেসিস, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের গভীর অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের লেখা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তারা মন এবং আত্মার (প্রকৃতপক্ষে যার কোন অস্তিত্ব নেই) সঙ্গে জীবনকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা জানেন না যে

যদিও সমস্ত জীবেরই জীবন রয়েছে কিন্তু কেবল যে সমস্ত প্রাণীর 'নার্ভাস-সিসটেম' রয়েছে তাদেরই কেবল মন রয়েছে, এবং তাদের মানসিক ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের উপর। হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত ধর্ম-যাজকদের বিশ্বাস সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরকম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। শ্রীযুক্ত স্বামী এবং দাস বলেছেন যে "আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের" মত অনুসারে আত্মা রয়েছে, আত্মার পুনর্জন্ম হয়, এবং পরম আত্মা ভগবানকে দেখতে না পাওয়া গেলেও তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হবে।

আমি জানতে চাই কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে এই সমস্ত তথাকথিত অধ্যাপকেরা এই ধরনের উদ্ভট মন্তব্য করছেন। তাঁদের মতে জড়পদার্থের সৃষ্টির আগেই জীবন ছিল। তারা বলেছেন, "কিছু আধুনিক বৈজ্ঞানিক আমাদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেন যে রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। পক্ষান্তরে জীবনের থেকেই জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছে।"

এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য? সবুজ গাছপালায় ফটো-সিনথেসিস নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই, সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। গাছপালা ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা সেই সমস্ত উদ্ভিদ্ বা উদ্ভিদ্‌ভোজী জীবদের আহার করে শক্তি সঞ্চয় করে। এই সমস্ত খাদ্যগুলি দাহ্যপদার্থরূপে জীবদের জীবনীশক্তি প্রদান করে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই সমস্ত খাদ্য থেকে জীবনীশক্তি মুক্ত হয়ে প্রাণশক্তিতে পরিণত হয়।

স্বামী এবং দাস বলছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না যেটা "আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিকেরা" পারেন। এই সমস্ত কপট বৈজ্ঞানিকদের ইন্দ্রিয়গুলি কি যথার্থ বৈজ্ঞানিকদের থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন? নাকি এই ধরনের তথাকথিত আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিকদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি ছাড়া আরও অন্য কোনরকম অনুভূতির ক্ষমতা রয়েছে?

ধ্যান করার মাধ্যমে জ্ঞান এবং উপলব্ধি আসতে পারে না। এই ধ্যান হচ্ছে এক-রকমের আত্ম-সম্মোহন।

স্বামী এবং দাস প্রশ্ন করেছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা একটা প্লাস্টিকের ডিম থেকে মুরগী তৈরী করতে পারেন কি না।

আমি জানি না তাঁরা জানেন কিনা যে, বৈজ্ঞানিকেরা দশটি মৌলিক পদার্থ তৈরী করেছেন যেমন ফেরমিয়াম, প্লুটোনিয়াম, আইনস্টাইনিয়াম, যা ভগবান তৈরী করতে পারেন নি। কেননা সেগুলো যে কিভাবে তৈরী করতে হয় তা তিনি জানতেন না। এই দুটি মানুষ কি শ্রীলঙ্কার বৈজ্ঞানিক ডঃ সিরিল পুন্নাম্পোরেমু এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ বালগোবিন্দ খোরানার সাফল্যের কথা জানেন? তাঁরা পৃথিবীর আদিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, জড়পদার্থের থেকে প্রোটোপ্লাজমের বিল্ডিং ব্লক অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী করেছেন। তাঁরা কি জানেন যে টেস্ট-টিউবে পুরুষের বীর্যের সঙ্গে স্ত্রীর অণ্ডকোষের সমন্বয় করা হচ্ছে, এবং একটি কৃত্রিম গর্ভে অথবা অন্য কোনও রমণীর গর্ভে তা ভ্রূণে পরিণত করা হচ্ছে?

এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষই কেবল এই ধরনের কার্যকলাপে প্রগতিশীল হয়েছে। মানুষ তা করতে সক্ষম হয়েছে তার জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে। অন্যান্য সমস্ত প্রাণীরা যখন কোটি কোটি বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে ছিল ঠিক সেইভাবেই রয়ে গেছে, তখন মানুষই কেবল গুহামানব থেকে আজকের মহাকাশ-মানবে পরিণত হতে পেরেছে তার বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক প্রগতির মাধ্যমে। সেটা কোন ভগবানের সাহায্যে বা কোন ধর্ম-শাস্ত্রের জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব হয়নি!

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতি এবং সমাজ-মঙ্গল সংস্থাগুলি অক্ষম লোকদের অক্ষম সন্তান-সন্ততি উৎপাদনে সহায়তা করছে। তার ফলে আপাত উদ্দেশ্য সাধন হলেও চরম উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতের সরকার "ভগবান থেকে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে" এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পঙ্গুদের পঙ্গু-সন্তান উৎপাদন করাটা বরদাস্ত করবে না।

মানুষের সৃজনী চিন্তাধারা হচ্ছে তার অপূর্ব ক্ষমতা যার ফলে সে প্রকৃতির সংগ্রামে সফল হতে পেরেছে। তার অতি উন্নত পুরোমস্তিষ্ক (forebrain) এবং গভীরভাবে সংবর্তমান মস্তিষ্কের বাহ্যাংশ (Cortex) তার সৃজনী চিন্তাধারাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ বাস্তব চিন্তাধারা সম্পন্ন। কেননা তাদের চিন্তাধারা উপলব্ধ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতীন্দ্রিয়বাদী এবং অতিপ্রাকৃতবাদী তথাকথিত যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিকদের কথা স্বামী এবং দাস উল্লেখ করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যাত্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। Chemistry, Physics, Mathematics, Geography, History, Geology, Anthropology, Polyemptology, Engineering, Medical Science, Astronomy, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থ বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিকদের অবদান আর অধ্যাত্মবাদীদের অবদান হচ্ছে 'আরব্য রজনী', 'গালিভারের ভ্রমণ' 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বাইবেল', 'কোরাণ', 'জাতক', 'জ্যোতিষ', 'হস্তরেখা বিচার', 'ধর্মশাস্ত্র', 'পিশাচ-তন্ত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি বাস্তব-ভিত্তিক কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থগুলি কল্পনাপ্রসূত।

আধুনিক যুগের মানুষের অপূর্ব কীর্তি—আণবিক শক্তির উদ্ভাবন, মহাশূন্যে অভিযান, চন্দ্রে পদার্পণ, Organ transplantation, Satellite, communication ইত্যাদি। সবই সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। বিকৃত মস্তিষ্ক অধ্যাত্মবাদীরা কেবল তাঁদের অলীক কল্পনাপ্রসূত দিবাস্বপ্ন

দেখতে পারেন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, এছাড়া আর কিছু তাঁরা করতে পারেন না।

ইতি,
ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর

Sunday Times
September 4, 1977

এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছি

(শ্রীল হংসদূত স্বামী লিখিত)

আমার আগের চিঠিতে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে ডঃ কভুর মূল বিষয়টির উত্তর না দিয়ে বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা পাঠককে বিভ্রান্ত করে মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যদি রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা আধুনিক কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দাবী করছেন, তাহলে কভুরের মত বৈজ্ঞানিক সেই রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে জীবন সৃষ্টি করুন।

এই প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে তিনি খুব চাতুর্যের সঙ্গে লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিকেরা ফেরমিয়াম, প্লুটোনিয়াম এবং আইনস্টাইনিয়াম ইত্যাদি দশটিরও অধিক মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করেছেন।" কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্থের থেকে জীবন সৃষ্টি করতে পারেন নি। ডঃ কভুর বলছেন যে ডঃ সিরিল পুন্নামপেরেমু এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ বালগোবিন্দ খোরানা জীবন্ত প্রোটোপ্লাজমের বিল্ডিং-ব্লক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। সেটিই যদি হয় তাহলে ডঃ কভুর কেন এই বিল্ডিং-ব্লকগুলো দিয়ে জীবন সৃষ্টি করছেন না? আমি এখনও তাঁকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছি।

ডঃ কভুর যে গর্বভরে 'টেস্টটিউব বেবীর' কথা উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধেও আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে জীবন্ত স্ত্রী এবং পুরুষের অণ্ডকোষ এবং বীর্য নেওয়ার ফলে এই টেস্টটিউবে তথাকথিত শিশু উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই শিশুটি তৈরী করবার জন্য যে বীজের প্রয়োজন তা তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তৈরী করতে পারেন নি। সুতরাং টেস্ট-টিউবে এই গর্ভাধান কার্যে বৈজ্ঞানিকদের কি কৃতিত্ব আছে? ভগবান প্রতিদিন প্রকৃতির টেস্ট টিউব—মাতৃজঠরে, কোটি কোটি শিশু সৃষ্টি করছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুকে মাতৃজঠরে হত্যা করছেন, এবং সেটাই হচ্ছে তাঁদের "বৈজ্ঞানিক প্রগতি"। ডঃ কভুরের মন্তব্য হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিকেরা "বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, কেননা তাঁদের চিন্তাধারা উপলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত"। তাঁর এই মন্তব্য, আমাদের বক্তব্য, 'আত্মা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত' এই তথ্যটিকেই প্রতিপন্ন করছে। তাই আত্মাকে জানতে হলে সীমিত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির ওপর নির্ভর না করে অন্য কোনও উন্নত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। Empirical কথাটির অর্থ হচ্ছে 'উপলব্ধজ্ঞান'। এই ধরনের জ্ঞানের উপলব্ধি সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়ে থাকে এবং তাই তার ফল স্বভাবতই সীমিত এবং ভ্রান্ত। সেই জন্যই, আত্মা এবং ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা ডঃ কভুরের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সকলেই বুঝতে পারে। কিন্তু ডঃ কভুর সেই সরল সত্যটি না মেনে গোঁয়ার্তুমি করে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে গিয়ে বুদ্ধিমান সমাজে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। ডঃ কভুর বলেছেন, "মানুষের সৃজনী চিন্তাধারা হচ্ছে তার একটা অপূর্ব ক্ষমতা যার ফলে সে প্রকৃতির সংগ্রামে সফল হতে পেরেছে।" এটা একটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন দাবী যা একটা মূর্খই কেবল করতে পারে। প্রকৃতি জোর করে প্রত্যেককেই

জরা, ব্যাধি অবশেষে মৃত্যুর দ্বারা কবলিত করে। পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী বীরেরা পর্যন্ত প্রকৃতির দ্বারা মৃত্যুর করাল গ্রাসে অসহায়ভাবে কবলিত হয়েছে। ডঃ কভুরই কি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানুষ হবেন যাঁর মৃত্যু হবে না? সেটা যথা-সময়েই দেখতে পাওয়া যাবে।

অবশেষে ডঃ কভুর বলছেন, "আধুনিক যুগে মানুষের প্রগতির অপূর্ব অবদান হচ্ছে আণবিক শক্তি উদ্ভাবন, মহাকাশ অভিযান, চন্দ্রে পদার্পণ" ইত্যাদি। প্রত্যেকেই জানে যে, এই আণবিক শক্তি উদ্ভাবনের পর তার প্রথম প্রয়োগ হয় অ্যাটম বোম রূপে, যা জাপানে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে হত্যা করেছিল।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে বছরের পর বছর গবেষণা এবং কঠোর পরিশ্রম করে বৈজ্ঞানিকেরা যে তথাকথিত চাঁদে গেছে, তাতে লাভ কি হয়েছে? তারা কতকগুলো আবছা ফটো আর কতকগুলো পাথর নিয়ে এসেছে এবং এখানে এসে প্রচার করছে যে, চাঁদ মানুষের বসবাসের অযোগ্য। এখন তারা আরও বেশী টাকা খরচা করে মঙ্গল গ্রহে যেতে চায়। এ নিয়ে বড়াই করার কি আছে? পক্ষান্তরে এ নিয়ে তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। এটা নেহাৎ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এই গ্রহে লক্ষ লক্ষ মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তাদের আশ্রয় নেই, তারা যথার্থ শিক্ষা পাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিকেরা যদি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে চাঁদ থেকে কতকগুলো পাথর আনার পরিবর্তে জনসাধারণের এই কষ্টার্জিত টাকা এই পৃথিবীতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ব্যয় করত তাহলে অনেক ভাল হত। পাথর পাথরই, তা সে চায়না থেকেই আনা হোক, বা চাঁদ থেকেই আনা হোক বা মঙ্গল গ্রহ থেকেই আনা হোক্। না কি বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে এই পাথরগুলিকে রুটি এবং মাখনে পরিণত করতে পারবেন!

এখন আসল কথায় আসা যাক্। জীবনের থেকেই যে জড়পদার্থ এবং জীবনের উৎপত্তি হয়; আত্মা আছে; আত্মার পুনর্জন্ম হয়, এবং পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, ডঃ কভুর তার প্রমাণ দাবী করছেন। কথায় বলে, "আগুন দিয়েই আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।" তাই আমি ডঃ কভুরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে আমাদের ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের সভ্যদের লেখা বিজ্ঞানভিত্তিক কতকগুলি গ্রন্থ পড়ে বিজ্ঞানের মাধ্যমেই আমাদের এই দাবীটি সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা তিনি করুন। ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের এই সমস্ত সভ্যরাই বিভিন্ন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি উপাধি প্রাপ্ত। এই বইগুলি পড়লে তিনি সহজেই যুক্তির মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মাধ্যমে জানতে পারবেন যে জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি হয় না, জীবন থেকেই জীবনের উদ্ভব হয়।

ইতি,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ভৃত্য
হংসদূত স্বামী
ইস্‌কন্ শ্রীলঙ্কা

'Sunday Times' এই বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি ছাপানোর পর, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ডঃ কভুরকে জনসাধারণের সম্মুখে প্রমাণ করতে বলেন যে রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়। ডঃ কভুর যদি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেন—একটা ইঁদুর, একটা বেড়াল বা একটা মশা বা যে কোনও জীব সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়—

"শ্রীলঙ্কার র‍্যাস্‌নালিস্টদের কর্ণধার ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর, যিনি বহু বছর ধরে ভগবানের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণ করার জন্য মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে আসছেন, তিনি এখন নিজেই একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।"

"ইস্‌কন্ (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) ডঃ কভুরকে, তাঁর দাবী—জীবনের উদ্ভব হয়েছে জড় পদার্থ থেকে, প্রমাণ করবার জন্য চ্যালেঞ্জ করছে।"

"আমরা, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সভ্যরা, খোলাখুলিভাবে ডঃ কভুরকে চ্যালেঞ্জ করছি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবন সৃষ্টি করতে, অন্ততঃ একটা মশা সৃষ্টি করতে এবং সেটা যদি তিনি না পারেন, তাহলে তিনি যেন চিরকালের জন্য এ বিষয়ে চুপ করে থাকেন।" ইস্‌কনের সভ্যরা জানান।

"তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন হলে ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ডঃ কভুরের জন্য অপেক্ষা করবেন। জনসাধারণকে এই সভায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তাঁদের এইজন্য কোন প্রবেশমূল্য দিতে হবে না।"

সংবাদপত্রগুলি যখন এই বিষয় নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছিল, হংসদূত স্বামী এবং ডঃ কভুর তখনও নিজেদের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান করছিলেন। সেই আদানপ্রদানের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

হংসদূত স্বামী
ইস্‌কন, শ্রীলঙ্কা
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর
শ্রীলঙ্কা র‍্যাস্‌নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

প্রিয় ডঃ কভুর,

ভগবানের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব এবং আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আরও কতকগুলো কথা আমি আপনাকে লিখতে মনস্থ করেছি। আমি মনে করি সেগুলো আপনাকে বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অবগত হতে সাহায্য করবে।

জড় বৈজ্ঞানিকদের সবচাইতে বড় রোগ হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোন তত্ত্ব প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তারা সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। যখন কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও মন্তব্য করেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন, তখন সকলেই তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে, এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করা হয় না। যখন আমরা ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের আত্মা সম্বন্ধে বলি, তাদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, "আত্মার অস্তিত্ব আমরা কিভাবে উপলব্ধি করতে পারি?" যেহেতু তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, তাই তাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কিনা। কিন্তু সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদেরও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক তথ্য রয়েছে যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না। আত্মার অস্তিত্ব বাস্তব সত্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে হয় নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে—শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান) অথবা ভগবত্তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের কাছ থেকে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন সকলেই জানেন যে গণিতজ্ঞরা 'i' নামক একটি কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে কাজ করেন যা হচ্ছে বিয়োগ চিহ্ন-যুক্ত এক-এর বর্গমূল অর্থাৎ $\sqrt{-i}$ (Square root of minus one is equal to i) এই সংখ্যাটি ১, ২, ৩ ইত্যাদির মত একটি সাধারণ সংখ্যা নয়, কিন্তু অঙ্কের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই এই কাল্পনিক সংখ্যাটির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এভাবে আমার দেখতে পাই যে, যদিও কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সংখ্যাটিকে প্রমাণ করা যায় না, তবুও এই সংখ্যাটিকে অস্বীকার করা যায় না। Statistical mechanics-এর ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের মতবাদ এবং যুক্তি ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন রকমের কল্পনাপ্রসূত আদর্শ ব্যবহার করে থাকেন, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। যদি বৈজ্ঞানিকরা এই ধরনের আনুমানিক এবং কাল্পনিক আদর্শ স্বীকার করে থাকেন, তাহ'লে পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া সম্পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান স্বীকার করে নিতে অসুবিধাটা কোথায়?

গবেষণাভিত্তিক বিজ্ঞানের অতীত আর একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হচ্ছে হাইসেনবার্গারের অনিশ্চিত তত্ত্ব (Hisenberger's uncertainty Principle)। এই তত্ত্বটি হচ্ছে, যে কোন বস্তুর অবস্থান এবং গতিবেগ (Momentum) একই সঙ্গে নির্ধারণ করা অসম্ভব। গণিত শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয়, "The product of the uncertainties in the measured values of the position and momentum cannot be smaller than Planck's constant." কোন গবেষণার দ্বারা এই তত্ত্বটি প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তবুও পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরাই এই তথ্যটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এটা কোনদিনও তারা প্রমাণ করতে পারেননি। তেমনই Thermodynamics-এর তৃতীয় সূত্রটি কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

আর একটি বিষয়ও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির ক্রমাগতই পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে (১৮০৮ সালে), জন ডালটন তাঁর Atomic theory প্রতিষ্ঠা করে বললেন যে, পরমাণুই হচ্ছে

সবচাইতে ক্ষুদ্র পদার্থ এবং তাকে আর বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু সেই শতকের শেষ দিকে ডালটনের Atomic theory ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল এবং দেখা গেল যে, পরমাণুকেও ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রনে বিভক্ত করা সম্ভব। আরও দেখা গেল যে, কিছু পরমাণু থেকে Alpha এবং Beta particles বিচ্ছুরিত হয় যা থেকে নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হয়, এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী হয়েছে। তেমনই অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে নিউটনের মেকানিক্‌স বৈজ্ঞানিকদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, কেননা সেই তথ্য স্থূল জড় পদার্থে সরাসরিভাবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তবুও বিংশ শতকের প্রথমদিকে Fundamental particles আবিষ্কার হওয়ার ফলে দেখা গেল যে, নিউটনের মেকানিক্‌স এই সমস্ত particles-গুলিকে বর্ণনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তারই ফলে Quantum mechanics-এর সূচনা হল যার মাধ্যমে এই সমস্ত particles-গুলির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা হল। এই সমস্ত মতবাদগুলির প্রায় সবই অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রতিনিয়তই এই অনুমানগুলির পরিবর্তন হচ্ছে। যে ভাবে অতীতের এবং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক থিয়োরীগুলির পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে সেইভাবেই পরিবর্তিত হবে।

এর থেকে সহজেই দেখতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কও ভ্রান্তিপূর্ণ, এবং সেই সমস্ত মস্কিষ্ক-প্রসূত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিও সর্বদা ভ্রান্তই হবে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান সর্ব-অবস্থাতেই অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়, কিন্তু এই অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে হলে এমন কারও কাছে যেতে হবে, যিনি অভ্রান্ত। এবং সেই উন্নত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ। আপনার মত একটি বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের কাছে এটা হয়ত একটা অবিশ্বাস্য উক্তির মত শোনাবে কিন্তু তা হলেও এটা সত্য। যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন

যে কোন মানুষই এটা বুঝতে পারবেন, বিশেষ করে যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোনও তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে এই বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন করবেন।

এই পন্থাটি অত্যন্ত ব্যবহারিক। গুরুদেব পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন, এবং শিষ্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা অনুশীলন করেন। শিষ্য যখন তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই জ্ঞানের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে তখন সে বুঝতে পারে যে তার গুরুপ্রদর্শিত এই পন্থাটি যথার্থ। এইভাবে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হয়। সৎ বৈজ্ঞানিকের প্রামাণিক তথ্য অনেকটা এই রকমই, তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল, গবেষণার প্রক্রিয়া পেশ করেন এবং যদি কেউ কেউ সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চান, তাহলে তিনি নিজে সেই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে যখন আরেকজন বৈজ্ঞানিক একই ফল প্রাপ্ত হন, তখন তা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত হয়।

সবশেষে আমি একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আপনি দেখবেন কেউ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, তখন তার নৈতিক চরিত্রের প্রভূত অবনতি হয়। যদি ঘটনাক্রমে কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে জীবনের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং পরমেশ্বর ভগবান বলে যদি কেউ না থাকেন, যদি কোন সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্তা না থাকেন, তাহলে নৈতিক বাধ্যবাধকতার কি প্রয়োজন? এটা কোন নতুন দর্শন নয়। প্রাচীনকালে গ্রীসে এপিকিউরাস নামক একজন দার্শনিক একটা মতবাদের সৃষ্টি করেছিল যে, সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু এবং শূন্যের সমন্বয়ের ফলে। আধুনিক যুগে "Epicure" শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোজনপরায়ণ কামুক মানুষ। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায়, যে-দর্শন পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার করে না পক্ষান্তরে জড় জগৎটাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে

মনে করে এবং মনে করে যে ঘটনাক্রমে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দর্শন মানুষকে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে পরিচালিত করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে সমাজের অধঃপতন হয়। আমাদের চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—আত্মাকে অস্বীকার করার ফলে, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অগণিত ভ্রূণহত্যা হচ্ছে—মা তার নিজের শিশুকে হত্যা করছে, কেননা তাদের শেখানো হচ্ছে যে, এই ভ্রূণ কোন চেতন জীব নয়, সেটা কতকগুলো অচেতন রাসায়নিক পদার্থের পিণ্ডমাত্র। তাই মানুষ আজ নির্দয়ভাবে জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে সেই সমস্ত শিশুদের হত্যা করছে।

এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসাহী এবং এ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ থাকলে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেও প্রস্তুত। শুভেচ্ছান্তে।

বিনীত

হংসদূত স্বামী

ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর

শ্রীলঙ্কা র‍্যাস্‌নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

মিঃ হংসদূত স্বামী

ইস্‌কন্‌, শ্রীলঙ্কা

প্রিয় মহাশয়,

আপনার চিঠি থেকে এটা আমি স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আপনার প্রত্যয় উৎপাদন করানো অসম্ভব, কেননা আমার দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, আর আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে 'বেদ' নামক কতকগুলো লোক বঞ্চনাকারী গ্রন্থ।

আপনি যদি আমাকে জোর করেন যে, জনসমক্ষে প্রদর্শন করার মাধ্যমে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থ থেকে রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের সৃষ্টি হয়, তাহলে আমিও আপনাকে বলতে পারি যে, আপনার বক্তব্য "সবকিছুই ভগবানের সৃষ্টি, এবং তাঁর সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তেই চলছে" তাও আপনি জনসাধারণের সামনে প্রদর্শন করার মাধ্যমে প্রমাণ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তা প্রমাণ করার জন্য আপনার "ভগবানকে" আনতে পারছেন, ততক্ষণ আপনিও আশা করতে পারেন না যে, আমি একতরফা এই প্রমাণের দায়িত্ব গ্রহণ করব।

আমার মতে, এই ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে, স্থান এবং কালের অন্তর্গত জড় পদার্থ এবং শক্তির সমন্বয়। এ সম্বন্ধে কোন সৃষ্টিকর্তার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না, কেননা জড়পদার্থ, শক্তি, স্থান এবং কালের কোন আদি বা অন্ত নেই। সব রকমের প্রাণেরই সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বৎসর ধরে বৃহৎ—অণু (macromolicules) এবং প্রোটিনের বিবর্তনের প্রভাবে যা কোন বিশেষ অবস্থায় উদ্ভূত হয়েছিল। আপনি কি বলতে পারেন আপনার 'ভগবান'কে কে সৃষ্টি করেছিল এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় ছিলেন?

সত্যের সন্ধানে,

ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর

হংসদূত স্বামী
ইস্কন্, শ্রীলঙ্কা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর
শ্রীলঙ্কা র‍্যাস্‌নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

প্রিয় ডঃ কভুর,

আপনার ১০ই সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠিটি আমি পেয়েছি এবং সেটি পড়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়েছি।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় উৎপাদন করার চেষ্টাটি যদি নিরর্থক হয় তাহলে আপনার বিজ্ঞান, যুক্তি এবং সত্য অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন? চিঠির শেষে আপনি লিখেছেন—'সত্যের অনুসন্ধানে'—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি এখনও সত্যের সন্ধান পাননি। সেটাই হচ্ছে আপনার গলদ। আপনি এখনও সত্যের সন্ধান পাননি, কিন্তু আপনি এমনভাবে অভিনয় করছেন এবং কথা বলছেন যে, আপনি যেন সত্যকে উপলব্ধি করে বসে আছেন।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম *সূত্র* হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাঃ* অর্থাৎ মনুষ্য জন্ম পাওয়ার পর আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পরম সত্য অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। ভগবান সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই, তবুও আপনি লিখছেন, 'স্রষ্টা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না...।'

সোজা কথায় আপনি বলতে চান যে, জীবনের উদ্ভব হয়েছে ঘটনাক্রমে কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে। সেটাই যদি সত্য হয়—এবং এই তথ্যের মাধ্যমে আপনি যদি নিজেকে একজন যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক এবং সত্য অনুসন্ধানী বলে প্রতিপন্ন করতে চান—

তাহলে কেন বারবার আমার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আপনি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের মাধ্যমে জীবনের সৃষ্টি করতে পারছেন না?

আপনি বলছেন যে, আপনার দর্শন "বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত"। তাহলে কতকগুলো জড় পদার্থের মিশ্রণের প্রভাবে যে জীবনের সৃষ্টি হয়, তার প্রমাণ কোথায়? কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ করে সেটা প্রমাণ করুণ! আপনি বলছেন, "আমার মতে, এই ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবল স্থান এবং কালের ভিত্তিতে জড়পদার্থ এবং শক্তির সমন্বয় মাত্র।" তাহলে এই জড় পদার্থ, শক্তি, এবং কাল এবং স্থান এলো কোথা থেকে? কোনরকম প্রমাণ না দিয়েই আপনি বলছেন, "কোন স্রষ্টার প্রশ্নই উঠতে পারে না কেননা জড়পদার্থ, শক্তি, কাল এবং স্থান এদের কোন শুরু বা শেষ নেই।" আর তারপরেই আপনি জিজ্ঞেস করছেন, "আপনার 'ভগবানকে' কে সৃষ্টি করেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? আপনার মন্তব্যগুলি অত্যন্ত খাপছাড়া—আপনি যে কি বলতে চান সেটি আপনি নিজেই জানেন না। প্রথমে আপনি বলছেন যে জড়পদার্থ, শক্তি, কাল এবং স্থান এদের কোন শুরু বা শেষ নেই, আর তারপরেই আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে ভগবান কোথায় ছিলেন। এটা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সত্যের অনুসন্ধানে এখনও আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে।

যখন বৈদিক জ্ঞান স্বীকার করে নেওয়া হয়, তখন সমস্ত গবেষণার মীমাংসা হয়। *বেদান্ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "সমস্ত জ্ঞানের অন্ত বা শেষ।"

আপনার সমস্ত আজগুবি মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন না করেই আসল বিষয়টিকে আচ্ছন্ন করে আপনি counter-challenge করছেন ভগবানকে জীবন সৃষ্টি করার জন্য। একজন কপর্দকশূন্য

ভিক্ষুককে বিচারালয়ে তার রোজগারের উপায় প্রদর্শন করতে বলা হলে সে যদি উল্টে চ্যালেঞ্জ করে বসে যে, সরকারকে তার রোজগারের উপায় প্রদর্শন করতে হবে, আপনার মনোভাবটা অনেকটা সেরকমই। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কখনই বরদাস্ত করা হয় না।

রোমান, গ্রীক, ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রমাণ প্রদর্শন করার দায়টা বিবাদীর, বাদীর নয়। বেদকে আপনি 'লোক-বঞ্চনাকারী গ্রন্থ' বলেছেন, ভগবানকে আপনি কল্পনা বলেছেন, এবং যাঁরা ভগবান এবং বেদকে অনুসরণ করেন, তাঁদেরকে বিকৃতমস্তিষ্ক, অজ্ঞ, অন্ধ-বিশ্বাসাচ্ছন্ন বলেছেন। তাই এই অপবাদগুলি প্রমাণ করার ভারটা আপনার। কোনরকম প্রমাণ না দিয়েই আপনি বলছেন, "স্রষ্টার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না...সবকিছুরই উদ্ভব হয়েছে ঘটনাক্রমে কতকগুলো জড়পদার্থের সমন্বয়ের ফলে।" এটা কি আমাকে একজন অন্ধের মত মেনে নিতে হবে? এটা প্রমাণ করার দায় আপনার। কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় করে আপনি জীবনের সৃষ্টি করুন। সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্যন্ত একটা মশার মত নগণ্য প্রাণীও, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টি করতে পারেনি। সুতরাং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনিই হচ্ছেন বিকৃতমস্তিষ্ক, মূর্খ, অন্ধ-বিশ্বাসাচ্ছন্ন একটা বদ্ধ পাগল।

বেদ কতকগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের লেখা গ্রন্থ বলে আপনার মত বিকৃতমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকেরা *বেদের* অবমাননা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আপনাদের বিকৃত মস্তিষ্কে এই সুস্থ বিচারটি আপনারা করতে পারেননি—তাঁরা কিরকম আদিবাসী যাঁরা এমন একটি ভাষায় সেই গ্রন্থটি রচনা করেছেন যার ব্যাকরণ, শব্দবিন্যাস, ছন্দ এবং কাব্য এত উন্নত এবং এত নিখুঁত যে সেই ব্যাকরণ শিখতেই একজন পণ্ডিতের বার বছর সময় লাগে, তাঁরা কিরকমের আদিবাসী যাঁরা হাজার

বছর আগে এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ স্থায়িত্বের সময় মাপতে সক্ষম হয়েছিল? তাঁরা কি ধরনের আদিবাসী যাঁরা হাজার হাজার বছর আগে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করে গিয়েছিল, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং কেবল আংশিকভাবে সে সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়েছে? আপনি কি একজন বৈজ্ঞানিককেও দেখাতে পারেন, যে গর্ভে প্রাণের বিকাশ কি করে হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারে, যা তথাকথিত বৈদিক আদিবাসীরা হাজার হাজার বছর আগে দিয়ে গিয়েছিলেন? এই ধরনের অসভ্য আদিবাসীরা কি করে *বেদে* বিভিন্ন ধরনের সমস্ত প্রাণীর সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে দিয়ে গিয়েছিল যার সংখ্যা হচ্ছে চুরাশী লক্ষ? এই *বেদ* যা আপনার মতে কতকগুলি অসভ্য আদিবাসীর লেখা লোক-বঞ্চনাকারী গ্রন্থ, কি করে সঙ্গীত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাজনীতি, স্থাপত্যশিল্প, যুদ্ধবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে এত নিখুঁত এবং বিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রদর্শন করতে পারে? অসভ্য আদিবাসীরা কি করে লিখতে বা পড়তে পারার কৌশল রপ্ত করলেন, পরমাণু ও পরমাণু শক্তির কথা ত' ছেড়েই দিলাম? সেই সমস্ত অসভ্য আদিবাসীরা কি করে বিভিন্ন গ্রহের গতিপথ, তাদের আয়তন, তাদের গ্রহণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন? কিভাবে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন আর কিভাবেই বা তাঁরা আত্মা, পরমাত্মা এবং ভগবান সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন?

কৃষ্ণ যদি হিন্দু আদিবাসীদের কুসংস্কার প্রসূত দেবতা হতেন, তাহলে 'ওপেনহাইমারের' মত বৈজ্ঞানিক কেন তাঁর দেওয়া *ভগবদ্গীতা* পাঠ করেছিলেন। আইনস্টাইন, সোপেনহাওয়ার, কান্ট, হেগেল, এমারসন, থরো, সোয়াইৎজার এবং অন্য অনেক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক যাঁরা আপনার থেকে অনেক বেশী বিখ্যাত এবং অনেক উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন

তাঁরা বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করে তার ভুরিভুরি প্রশংসা করে গেছেন—বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার*। এই 'বেদ' যদি কতকগুলো অসভ্য আদিবাসীদের বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনামাত্র হত তাহলে তাঁরা কেন এত সম্মানের সঙ্গে এই গ্রন্থগুলো পাঠ করেছিলেন। আপনি কি মনে করেন যে, এই সমস্ত মহাপণ্ডিত স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলো মূর্খ এবং নির্বোধ, যাঁদের আর কিছু করার ছিল না বলে কতকগুলো অসভ্য আদিবাসীদের লেখা পড়ে তাঁদের সময় নষ্ট করেছিলেন? না কি 'বেদ' হচ্ছে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞানসমন্বিত গ্রন্থ যা সৃষ্টির আদিতে ভগবান নিজে দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে এখনও বর্তমান, যে সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার কোন জ্ঞান নেই।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে, আপনার সীমিত জ্ঞান-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার ওপর নির্ভর না করে, কিছু সময় নিয়ে ঐকান্তিকভাবে বৈদিক গ্রন্থে যে কি জ্ঞান রয়েছে তা জানবার চেষ্টা করুন। তাহলে আপনার এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয়।

ভগবানের স্বপক্ষেই বলা হোক্ বা বিপক্ষেই বলা হোক্, সেই আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেন ভগবান। আপনি বলেছেন, "আমি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে, যে-জিনিসের অস্তিত্ব নেই সে সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করা বিজ্ঞানের পন্থা নয়।' কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার মত তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব নেই তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। ভগবানের অস্তিত্ব যদি নাই থাকত তাহলে তার সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে কি দরকার? 'ন্যায়' অনুসারে, যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই সে সম্বন্ধে অনুমান করা যায় না। সুতরাং যার অস্তিত্ব নেই, যার সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় না, তা নিয়ে আলোচনা করার কি প্রয়োজন—তা স্বপক্ষেই হোক্ বা বিপক্ষেই হোক্?

কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের উন্মত্ততা দেখা যায় যে তারা ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা না করে থাকতে পারে না, তাদের মতে যার কোন অস্তিত্বই নেই। দেখা যায় যে তাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের উৎপত্তি এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে ভগবান্ এবং শাস্ত্রগ্রন্থের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ প্রকাশ করা। যদিও কেউ কোনদিনও জড় পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্ভব হতে দেখেনি, তবুও এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতে চায় যে কতকগুলো জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে ঘটনাক্রমে প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এই ধরনের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে কতকগুলো অপগণ্ড মূর্খের বিজ্ঞান।

আপনার এবং আপনার মত বৈজ্ঞানিকদের প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে—আপনারা প্রমাণ করুন যে কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়; রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন সৃষ্টি করুন। আপনি কেন সেটা করতে পারছেন না? আপনি একটা নির্বোধের মত নানারকম কথা বলে চলেছেন কিন্তু কোথায়, জীবন সৃষ্টি করুন? সূর্যের কিরণ রয়েছে, পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে, জল রয়েছে, বায়ু রয়েছে, আগুন রয়েছে এবং সবকটি উপাদানই রয়েছে, এবং সর্বোপরি ভগবানের সৃষ্ট জীবন রয়েছে। আপনি যদি ভগবানের থেকে মহৎ হন, তাহলে আপনি সেরকম কিছু একটা সৃষ্টি করুন? যদি সৃষ্টি করতে না পারেন, যদি কিছু তৈরী করতে না পারেন, তবে শুধু শুধু কথা বলে লাভ কি? আপনার কি ক্ষমতা রয়েছে? আপনি আপনার নিজের বার্ধক্য রোধ করতে পারেন নি, আপনার জরা রোধ করতে পারেন নি, ব্যাধি রোধ করতে পারেন নি এবং পরিণামে আপনার মৃত্যুকেও রোধ করতে পারবেন না। আপনি কিছুই করতে পারেন না,

কিন্তু তবুও আপনি কথা বলে চলেছেন। বলে চলেছেন যে জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি হয়। আপনি কেবল একটা বাক্‌চতুর প্রতারক মাত্র, কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নিজের জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু প্রতিহত করুন। আমি আপনাকে বলেছিলাম অন্ততঃ একটা ডিম সৃষ্টি করতে—সেটা কোথায় গেল? একটা মুরগীও আপনার থেকে বড় বৈজ্ঞানিক, কেননা সেটা ডিম পাড়ে এবং এক মাসের মধ্যে আরেকটা মুরগীর ছানা সৃষ্টি করে। সুতরাং আপনি একটি মুরগীর থেকেও অধম। মুরগী প্রাণ সৃষ্টি করছে, কিন্তু আপনি কতকগুলো নিরর্থক শব্দ ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না।

ইতি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবক,

হংসদূত স্বামী

এইভাবে জনসমক্ষে জীবন সৃষ্টি করার জন্য হংসদূত স্বামীর দ্বারা আহুত হওয়া সত্ত্বেও ডঃ কভুর এই বলে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবান নিজে এসে জনসমক্ষে জীবন সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনিও সেটা করতে বাধ্য নন। টাইম ম্যাগাজিনে সেই সংবাদ ঘোষণা করে বলা হয়েছিল "হতভম্ব কভুর পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।" তখন শ্রীল হংসদূত স্বামী ডঃ কভুরকে লেখা তার শেষ চিঠিটি পাঠান।

হংসদূত স্বামী
ইস্‌কন্, শ্রীলঙ্কা
September 21, 1977

ডঃ আব্রাহাম টি. কভুর
শ্রীলঙ্কা র‍্যাস্‌নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

প্রিয় ডঃ কভুর,

আপনি নিজেকে ভগবানের থেকেও বড় বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের ভক্তরা আপনাকে পরাজিত করেছে, যে কথা খুব স্পষ্টভাবেই খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠকেরা যথাযথভাবে অবগত হয়েছে।

একথা জেনে আপনি খুশী হবেন যে পৃথিবীতে আপনিই হচ্ছেন প্রথম তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যাকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং তার প্রতারণার মুখোশ জনসমক্ষে সম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে। আপনার এই ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। বহু পূর্বেই অধিকাংশ ধর্মীয় সংস্থাগুলি থেকেই পারমার্থিক জীবন অন্তর্হিত হয়ে গেছে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে কেউই যথাযথভাবে আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এই যুগের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ধর্ম, যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা করছে—তা সম্পূর্ণরূপে যথাযথ বৈদিক ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে এবং অনুসরণ করছে। অবশ্য সেদিক দিয়ে প্রতিটি ধর্ম গোষ্ঠীই দাবী করে থাকে যে তাদের পন্থাটি হচ্ছে যথার্থ, কিন্তু কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল সেটা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। আপনার গলদ্‌টা হচ্ছে যেহেতু আপনি বারবার ধর্মের নামে কতকগুলি প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তাই আপনি মনে করে নিয়েছেন যে প্রতিটি ধর্মই হচ্ছে এক-

একটি ধাপ্পা, আপনি তাই ভগবান এবং ধর্মকে প্রতারণা বলে মনে করে নিয়েছিলেন, কিন্তু খাঁটি জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল নকল জিনিস ধরা পড়ে। সেটি আপনি বুঝতে পারেন নি। খাঁটি জিনিসটি যে কি সেটি আপনি জানেন না।

আমি বলতে চাই না যে প্রতিটি বৈজ্ঞানিকই প্রতারক, কিন্তু এটা বলতে আমি দ্বিধা বোধ করি না যে আপনি এবং অন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক দাবী করছেন যে জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করা যায়, তাঁরা অবশ্যই নির্বোধ অথবা প্রতারক। প্রকৃতপক্ষে, আপনি উভয়ই—কেননা আপনি গোঁয়ারের মত আপনার সেই ভ্রান্ত ধারণা যে, রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি করা যায় সেটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। আপনার এই মতবাদ এবং যে সমস্ত অ্যালকেমিস্টরা রাসায়নিক পদার্থ থেকে সোনা তৈরী করার চেষ্টা করেছিল এবং অকৃতকার্য হয়েছিল, তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অ্যালকেমিস্টদের নিয়ে উপহাস করে—কিন্তু সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরাই আবার কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবন তৈরী করবেন বলে দাবী করছেন। এটা কি নির্বুদ্ধিতার চরম প্রকাশ নয়? রাসায়নিক পদার্থ থেকে যে জীবন তৈরী হতে পারে তার উপযুক্ত প্রমাণ যদি আপনি দিতে পারেন, তাহলে আমি এখনও সেটি মেনে নিতে প্রস্তুত।

আপনার জীবন এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবং মৃত্যুর সময় যখন যমদূতেরা আপনার আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে, তখন হয়ত আপনি এই সমস্ত কথাগুলো মনে করবেন এবং তখনই হয়ত আপনি এর যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে, কেননা তখন আপনি অসহায়ের মত তাদের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আবর্তে প্রক্ষিপ্ত হবেন এবং অন্য একটি শরীর প্রাপ্ত হয়ে এই জড়জগতে অন্তহীন দুঃখ ভোগ করতে থাকবেন।

কিন্তু কেউ যদি কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে, তাহলেই সে এই দুঃখের হাত থেকে অনায়াসে রক্ষা পেতে পারে। আমি আশা করছি যে আপনি তাই করবেন।

ইতি—হংসদূত স্বামী।

১৫বছর আগে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই শ্রীল হংসদূত স্বামী ভগবানের বাণী প্রচারে তাঁর প্রচণ্ড উদ্যম প্রদর্শন করে এসেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগ দেন নিউইয়র্ক শহরে। তারপর তিনি মন্ট্রিয়ল, বোস্টন, ভ্যানকুভার এবং বার্কলীতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে জার্মানীতে যেতে বলেন। তাঁর সেই আদেশ শিরোধার্য করে তিনি সেখানে যান এবং ৫ বছর ধরে সেই দেশের বিভিন্ন নগরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের লেখা 'ভগবদ্গীতা অ্যাজ-ইট-ইজ', শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, এবং অন্য বহু গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়ে সেগুলি প্রকাশিত করেন। ১৯৭৬ সালে প্রভুপাদ তাঁকে সন্ন্যাস দান করেন এবং আজ তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্য, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বর্তমান আচার্যদের অন্যতম। এখন তিনি নর্থ-ওয়েস্ট আমেরিকা, সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আচার্য এবং পরিচালক।

(সম্পাদকের নিবেদন : ১৯৭৮ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর, শ্রীলঙ্কায়, ডঃ অ্যাব্রাহাম টি. কভুর মারা যান। যদিও তিনি ক্যান্সারের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয় হার্ট-ফেইলিওরের ফলে।)